Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

এক

''সমস্ত দেশের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ঘটনা সাক্ষ্য দেয় ধর্মই মানুষকে পতিত, দাস, উপেক্ষিত এবং ঘৃণাস্পদে পরিণত করেছে। ভারতীয় মানবতাকে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য কোন কিছুর যদি বেশি নষ্টামি থাকে তবে তা ধর্মের।''

—রাহুল সাংকৃত্যায়ন

গণবার্তা

সম্পাদকীয়	১
সংঘ পরিবার বিষাক্ত প্রচারে দেশের সর্বনাশ করে চলেছে	১
দেশে-বিদেশে	২
ভারতে গণতন্ত্রের সংকোচন...	৩
নানুরে বামগণতান্ত্রিক মঞ্চের নেতৃত্বে ডেপুটেশন	৪
আর এস এস প্রতিরোধে বিকল্প...	৫
অমর্ত্য সেন রচিত হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড প্রসঙ্গে	৬
পি এস ইউ সংবাদ	৭
ভারতীয় শ্রমজীবী মানুষের ঝুঁকির জীবন	৮

70th Year 30th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 13th May 2023

সম্পাদকীয়

ফেডারেল কাঠামোর সুরক্ষায় শীর্ষ আদালত

ভাষা সংস্কৃতির বৈচিত্রকে সমন্বিত করেই ভারতের রাজ্যসমূহের ফেডেরাল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র এ দেশের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই সংবিধানের কেন্দ্রীয় অভিমুখ বনাম সমন্বয়ী ফেডারেল অভিমুখের টানাপোড়েন রয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্য ভিত্তিক সামগ্রিক সুষম বাজার ব্যবস্থার জন্য এই দ্বন্দ্ব চিরকালই রয়েছে। পূর্বাঞ্চলের স্বার্থহানি করে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বিকাশের সমস্যা, মাশুল সমীকরণ নীতি ইত্যাদি বহু আলোচিত বিষয়। অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক এবং রাজ্যের স্বাধিকারের পরিসর নিয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও একটা মোটামুটি ভারসাম্য রাখার চেষ্টা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের শাসকদলগুলির পক্ষ থেকে করার ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং এককথায় কেন্দ্রশাসিত রাজধানী অঞ্চল ও ক্ষুদ্র রাজ্য দিল্লির সঙ্গে কেন্দ্রের সংঘাত আছে প্রথম থেকেই। ইদানীং 'আপ শাসিত' দিল্লির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সংঘাত বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বহু বছর ধরে বিভিন্ন মামলার রায়ের সূত্রে কেন্দ্র এবং দিল্লি রাজ্যের সম্পর্কটিকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শর্তের মাধ্যমে বেঁধে রাখতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত।

ইদানীং বিজেপি কেন্দ্রে এবং কয়েকটি রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান স্লোগানের ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রাভিমুখী শুধু নয়, কেন্দ্র নির্ভর হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই এগিয়ে চলার পদক্ষেপে দিল্লির উপরাজ্যপাল, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক বা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালদের মতোই অধিকাংশ সংঘ ঘরানার রাজ্যপালকে হাতিয়ার করে সংবিধানের ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদানসমূহ ধ্বংস করতে উন্মুখ। সম্প্রতি শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর দায়ের করা একটি মামলার সাপেক্ষে কেন্দ্র বনাম দিল্লি রাজ্যের স্বাধিকারের প্রসঙ্গে সংবিধানের ফেডারেল কাঠামোটাকেই যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে রায় দিয়েছেন।

জাতীয় রাজধানী কেন্দ্রশাসিত রাজ্য দিল্লির বিধানসভায় নির্বাচিত সরকার অন্যান্য রাজ্য সরকারের মতই প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক দায়িত্বের অধিকারী। যৌথ তালিকায়ও অন্যান্য রাজ্যের মত কেন্দ্রের সঙ্গে দিল্লির সমানাধিকার প্রাপ্য। শুধু মাত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, পুলিশ এবং ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি উপরাজ্যপাল বা লেফটেনেন্ট গভর্নরের। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পাবলিক সার্ভিস কমিশনারের অনুপস্থিতিতে প্রশাসনিক কাজকর্ম দিল্লির সরকারের হাতে থাকবে না, কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘোষণাটি বাতিল করেছে শীর্ষ আদালত।

এভাবে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত আইনের ছিদ্রটিও বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে সেই ছিদ্রটি ব্যবহার করে ফেডারেল কাঠামোকে ধ্বংস করার জীবাণু অনুপ্রবেশের সুযোগ না থাকে। শীর্ষ আদালতের এই রায়কে 'আপ' বা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর জয় বলে চিহ্নিত করার চেয়েও বিজেপির উদ্যোগে সংবিধানের স্তম্ভগুলি ধ্বংস করার প্রকল্পের বিরুদ্ধে মূল্যবান দিগ্‌দর্শন রূপে স্বাগত জানায় প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ।

মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্যপালকে ভর্ৎসনা

কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই সাংবিধানিক নীতি নৈতিকতা লঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে রাজ্যপালদের ক্ষমতা ব্যবহারে প্ররোচিত করছে।

মহারাষ্ট্রের ছয়জন রিট পিটিশনকারী গত বছর জুন মাসে রাজ্যপালের উদ্যোগে সাংবিধানিক নীতিনৈতিকতা লঙ্ঘন করে একনাথ শিন্ধেকে মুখ্যমন্ত্রী করার বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে মামলা করেন। যদিও একনাথ শিন্ধেকে আপাতত মুখ্যমন্ত্রী পদে বহাল রেখেছেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচজন বিচারপতি, তবুও রাজ্যপালের নীতিনৈতিকতা সম্বন্ধে এবং নির্বাচিত সরকারকে বিধানসভায় যথেষ্ট প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও গরিষ্ঠতা প্রমাণ করার নির্দেশকে নৈতিকতাহীন একদেশদর্শী বলে ভর্ৎসনা করেছেন। উদ্ধব ঠাকরে এই সময় স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে শীর্ষ আদালত একনাথ শিন্ধের মুখ্যমন্ত্রী থাকা নিয়েই সুস্পষ্ট আপত্তি ব্যাক্ত করল।

রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারী উচ্চতম কোনো ক্ষমতাবান শক্তির নির্দেশে এভাবে রাজ্যের নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করার মাধ্যমে সংবিধানের ফেডারেল কাঠামোটিকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন। শীর্ষ আদালতের রায়ে সেই বিষয়ে কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, দেশবাসীর মনে যে ঐতিহ্যগত সেকুলার এবং ফেডারেল কাঠামো নির্ভর ধারণা গড়ে উঠেছে, দেশের চরম সংকটের মুখে শীর্ষ আদালত এগিয়ে এসে মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করছে।

সংঘ পরিবার বিষাক্ত প্রচারে দেশের সর্বনাশ করে চলেছে। এসবের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম তীব্রতর করতেই হবে।

গত বছরের ডিসেম্বর মাসে মোদি রাজ্য গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেছে। এই নির্বাচনে মোদির দল মোট ১৮২টি আসনের মধ্যে ১৫৬টিতে জয়লাভ করেছে। ভোট কিভাবে হয়েছে এবং কিভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি অবিশ্বাস্য ফললাভ করেছে তা বুঝে ওঠা খুব কঠিন নয়। এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি সারা দেশে ব্যাপ্ত। তার মুখ্য কারণ গুজরাতের একদা স্বৈরশাসক নরেন্দ্র মোদি এখন ভারতের স্বৈরশাসক। তাঁর সরকারের পর্বতপ্রমাণ অসাফল্য এবং প্রবল যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতার জন্য একান্তভাবেই জড়িত মোদি-শাহ'র অনুসৃত প্রশাসনিক রীতি। তৎসত্ত্বেও গুজরাত আছে গুজরাতেই। সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব যে, যথাযথভাবে ভোটগ্রহণ হলে বিজেপি'র এই ফলাফল অসম্ভব।

প্রবলভাবে সাম্প্রদায়িক উগ্রতার প্রচারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন দেশের সংবিধানে উল্লেখিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। হাইভোল্টেজ প্রচার অজস্র আর্থিক ক্ষমতার বিকারগ্রস্ত প্রচারের ধরন। বিরোধী দলগুলিকে ক্রমাগত আক্রমণ ও প্রলোভন ইত্যাদির মাধ্যমে দুর্বল করে দেওয়া এবং ভোটের সময় নির্বিচারে প্রাণের ভয় দেখানো ছাড়া এমন ফলাফল অসম্ভব। অপার মহিমা এদশের জীর্ণ গণতন্ত্রের। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই দেশের পশ্চিমপ্রান্তের ওই রাজ্যটির রাজনৈতিক ধরনধারণের সঙ্গে পূর্ব প্রান্তের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বিচিত্র মিল। এ রাজ্যেও যেমন ২০১১ পরবর্তীকাল থেকেই সুষ্ঠু নির্বাচনের সম্ভাবনা লোপাট হয়ে গেছে।

স্বৈরতান্ত্রিক বা এককেন্দ্রিক শাসকদের মোডাই-অপারেন্ডি এক এবং অভিন্ন। আর মোদি ও মমতার মিল খুঁজতে কোনও বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তির প্রয়োজন নেই। চোখ কান খোলা রাখলেই বাস্তব অবস্থা বুঝে ওঠা সম্ভব।

গুজরাত বা তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের মতামত প্রকাশের সুযোগ যেমন সংকুচিত হয়েছে তেমনি, অন্যান্য অনেক রাজ্যে বিশেষত হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলিতেও বিশেষ উগ্রতার সঙ্গে এই পরিস্থিতি নির্মাণের ভয়ঙ্কর অপচেষ্টা অতি উগ্রভাবে চলছে। ধর্মবিশ্বাস যা, একান্তভাবেই ব্যক্তিগত বোধ তাকেই রাষ্ট্রিক প্রশাসন প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করে দেশের জনসমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলেছে। জাতপাত এবং বর্ণ বা আঞ্চলিকতা ভিত্তিক বোধে মানুষের মননকে জারিত করা চলছে অবিরত। নানা ধরনের প্রাক পুঁজিবাদী সমাজ সংস্কৃতি প্রায় জোর করেই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ভাবাদর্শ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বিপুল বেগে। এই বিষাক্ত সংস্থাটির সঙ্গে যুক্ত অগণিত শাখা সংগঠন দুর্বার বেগে উগ্র জাতীয়তাবাদের উন্মত্ততায় সাধারণের মননকে গ্রাস করে ফেলছে।

একদিকে ধর্মীয় মেরুকরণ আর অন্যদিকে প্রতিনিয়ত ভয়ের বাতাবরণ নির্মাণ চলেছে এক যোগে। কোনও মানুষ যদি এখনও যুক্তিবাদী মানসিকতা পালন করেন এবং তার প্রচার করেন তাহলে গুজরাত কিংবা উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে তাঁদের অশেষ দুর্গতির সম্ভাবনা।

ফ্যাসিবাদী শাসনের এমন ধরনটি মোটেই অপরিচিত নয়। ১৯৩০-এর দশকে জার্মানি বা ইটালিতে যেভাবে হিটলার ও মুসোলিনী বেশ কিছুকাল ধরে দেশের জনগণের প্রায় একশ শতাংশ সমর্থন পুষ্ট হয়ে বিশ্বমানবতার অপার ধ্বংস সাধনে মেতে উঠেছিল, তেমনই এক রূঢ় বাস্তবতার লক্ষণগুলি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভারতের মতো দেশে। অনেক অঙ্গরাজ্যও এই পথেরই কূটাভাস বিশেষভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে।

ফ্যাসিবাদী অপশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানুষের মনোজগতে বিশেষ পরিবর্তন। অল্প কিছুদিন আগেও যা মানুষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না, তাই এখন বিশেষ বিশ্বাসের বিষয়ে পরিণত হয়ে চলেছে। অগণিতবার সমস্ত ধরনের গণমাধ্যমে মানুষ যা দেখছেন বা শুনছেন তাই অবশেষে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে। পরিবর্ত কোনও মতামত বা মন্তব্য সাধারণের কাছে পরিবেশিত না হলে মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারকেই সত্য বলে মানুষ ধীরে ধীরে বিশ্বাস করে ফেলে। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার শক্তিও হারিয়ে যায়। স্বৈরশাসকদের উদ্দেশ্য পূরণ হয় সহজেই।

একদিকে অসত্য ও কাল্পনিক প্রসঙ্গগুলির লাগাতার প্রচার চলছে। শতাধিক টিভি চ্যানেল প্রতিদিন নানা বর্ণে সাজিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি প্রয়োজনীয় বলে তুলে ধরছে। মানুষের জীবন নির্বাহে মৌলিক প্রয়োজনগুলি যথা কর্মহীনতার ব্যাপক প্রসার, অভূতপূর্ব বেকারত্বের দুর্ভাগ্যজনক সমস্যা থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মন্দির নির্মাণের, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গটিকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনে বাস্তব বলে দেখানো হচ্ছে। যেন বহু সংখ্যক মন্দির মসজিদ কিংবা গির্জা নির্মিত হলেই সমস্ত জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যাবার সমস্যা আর থাকবে না। সমস্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের সমস্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অঢেল স্বাচ্ছন্দ্য আকাশ থেকে নেমে আসবে। রান্নার গ্যাসের দাম বা পেট্রোল ডিজেলের দাম পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। কল্পিত ঈশ্বরের অপার কৃপায় দেশের সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটবে এবং প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ দেশে বিদেশে অত্যন্ত সম্মানজনক জীবিকার সন্ধান পেয়ে যাবে।

সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের

—এরপর ৭ পাতায়

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে

ইউক্রেনকে রক্ষা করার জন্য মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন জার্মানীতে মিত্র গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এই বৈঠকের লক্ষ্য, কিয়েভে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। এর মাধ্যমে ইউরোপে যুদ্ধের আগুনে ইন্ধন জোগানোর কাজটা সুসম্পন্ন করা যেতে পারে।

এদিকে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা, নিকারাগুয়া, কিউবা ইত্যাদি দেশগুলি সফর করছেন। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে মার্কিনীরা তাদের খাসতালুক বলেই বহুকালযাবৎ মনে করে আসলেও, পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তন আগামী দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক আধিপত্যের ভিত্তিতে আঘাত হানতে পারে। ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা ডলারের বিকল্প হিসাবে দুই দেশের মধ্যে গ্রহণযোগ্য মুদ্রার প্রচলন করার লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলিও একই পথে চলার ভাবনাচিন্তা করছে। রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী লাভরভ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলার সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। প্রেসিডেন্ট লুলা লাতিন আমেরিকার দেশগুলির কাছে ডলারের একচেটিয়া আধিপত্য অবসানের জন্য জোট বাঁধার আহ্বান জানিয়েছেন।

বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও একটি জুমলা

দেশের শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুব বা শিক্ষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মোদি সরকার একের পর এক প্রবঞ্চনার আয়োজনে ব্যস্ত। কোনো কোনো মহল থেকে মোদির বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও স্লোগানটি দেশের মহিলাদের সঙ্গে একটি জুমলা বলে মনে করেনি। তারা এখন হত বিহ্বল।

গত জানুয়ারি মাসেই দেশের মহিলা কুস্তিগীর যাঁরা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন তাঁরা সারা ভারত কুস্তি ফেডারেশনের সর্বোচ্চ পরিচালক বিজেপির বিশিষ্ট নেতা ও ছয়বারের সাংসদ বৃজভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগকারিণীদের মধ্যে রয়েছে বিনেশ ফোগত, সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়ার (পুরুষ কুস্তিগীর)-এর মতো প্রখ্যাত কুস্তিগীরবৃন্দ সহ আরও অনেকে। এই ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে নাবালিকা কুস্তিগীরদের সঙ্গেও দুর্ব্যাবহারের অভিযোগ উঠেছে। মোদি সরকার নিয়ন্ত্রিত দিল্লি পুলিশ অপরাধীর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই নেয় নি। অবশেষে এই প্রখ্যাত মেয়ে কুস্তিগীররা দেশের শীর্ষ আদালতের শরণাপন্ন হন। দিল্লি পুলিশ যে, যৌন হেনস্থার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতেও অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালত পরিষ্কার নির্দেশ দেয় এবং এফ আই আর গ্রহণ করার আদেশ দেয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও পুলিশ শুধুমাত্র অভিযোগ নথিভুক্ত করে চুপচাপ বসে থাকে। বৃজভূষণকে গ্রেপ্তার করা দুরস্থান, কোনও প্রশ্ন পর্যন্ত করা হয়নি। অবশেষে কুস্তিগীররা গত ২৩ এপ্রিল থেকে দিল্লির যন্ত্তরমন্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচি নিতে বাধ্য হন। দীর্ঘ কুড়ি দিন তাঁরা ধর্নায়। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের দাবি মেনে কোনও পদক্ষেপ নেয় নি। বরং ধর্নামঞ্চে গভীর রাত্রে অবস্থানকারীদের ওপর মত্ত অবস্থায় দিল্লি পুলিশ আক্রমণ করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং দেশের বর্তমান শাহেনশাহ নরেন্দ্র মোদি সেই সময় কর্নাটক বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। মোদি-শাহ সামান্য সহানুভূতিসূচক মন্তব্যও করেন নি। দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম মুখ অনুরাগ ঠাকুর একবারের জন্যও ক্রীড়াবিদদের ধর্নামঞ্চে যান নি। পকসো আইনের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে তাঁর গুণগানেই ব্যস্ত শাসক দল।

বামপন্থী দলগুলি সহ বহু সংখ্যক বিবেকবান মানুষ গোষ্ঠী এবং দল নির্যাতিতা মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আর এস পি'র কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. আর এস ডাগর, কম. শত্রুজিত সিং এবং অন্যান্যরা ধর্নামঞ্চে পৌঁছে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছেন। গত ১২ মে দেশের ১৪টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যন্তরমন্তরে পৌঁছে আন্দোলনকারীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। আর এস এস প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন পি এস ইউ'র সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল সফিউল্লা ধর্নামঞ্চে বক্তব্য রাখেন। জাঠ সম্প্রদায়ের হাজার হাজার নেতা ও সদস্যবৃন্দ কুস্তিগীরদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। মোদির বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও স্লোগান যে নিতান্ত একটি ধোঁকা বা জুমলা তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

মণিপুর জ্বলছে। ডবল ইঞ্জিনের মহিমা অফুরন্ত

বিজেপির সরকার মণিপুরে। যত অনৈতিকতার মাধ্যমেই এই সরকার গঠিত হোক বাস্তবে বিজেপিরই সরকার। তথাকথিত ডবল ইঞ্জিন সরকার। এই সরকারেরও মুখ্য কর্মসূচি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বিভাজন নির্ভর। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, (যথার্থ এবং কল্পিত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত) তুলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো। সেই বর্বরতাপূর্ণ পথেই চলেছে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির সরকার। প্রধান নির্দেশক দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্বয়ং।

সকলেই জানেন যে মণিপুরের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য একভাগ উপত্যকা। বাকী তিনভাগ পাহাড় পর্বতে ঘেরা। একদিকে মায়ানমার অন্যদিকে অসম নাগাল্যান্ড মিজোরাম প্রভৃতি। উপত্যকায় বসবাস করেন মেইতেই সম্প্রদায়ের মানুষ। মুখ্যত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। মণিপুরের মোট জনসংখ্যার সিংহভাগ মেইতেই। এদের মধ্যে সামান্য কিছুসংখ্যক মুসলিম। বাংলার সঙ্গে মেইতেইদের গভীর সম্পর্ক চৈতন্যদেবের সূত্রে। অনেকেই তাঁকে ঈশ্বর বলে মনে করেন। এঁদের চাষযোগ্য জমির অভাব বহুদিনের।

পর্বতসঙ্কুল জেলাগুলিতে বাস করেন কুকি ও নাগা সম্প্রদায়ের উপজাতিরা। নাগাদের মধ্যে অনেক ভাগ এবং কুকি সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে নানা সময়ে সংঘাতও বাস্তব। এই উভয় সম্প্রদায়ই খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। পেশা বা জীবিকাগত প্রশ্নে এদের কোনও নির্দিষ্ট এবং সর্বজনগ্রাহ্য জীবিকার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ইনসারজেন্সি বা সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাকামী কর্মকাণ্ডর সঙ্গে যুক্ত থাকাও এই পার্বত্য অঞ্চলগুলির মানুষদের অন্যতম পেশা। নাগাদের সশস্ত্র সংগঠন এন এস সি এন (আইজাক-মুইভা) নাগা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে গ্রেটার নাগালিম-এর সঙ্গে যুক্ত করতে বিশেষ উৎসাহী। মেইতেই সম্প্রদায়ের কিছু মানুষও ভ্যালি সংলগ্ন পার্বত্য জেলাগুলিতে বসবাস করেন। এদের জমি কেনার সুযোগ নেই। কারণ সেসব উপজাতিদের অধিকার লংঘন করে। এ নিয়ে কোথাও কোথাও উত্তেজনার প্রসঙ্গ রয়েছে।

গত ৩ মে রাত্রি থেকে ইম্ফল ও চুড়াচাঁদপুর জেলায় মেইতেই ও কুকি সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে হানাহানি বিশেষ আকার ধারণ করে। উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার জন্য মেইতেইরা বেশ কিছুকাল যাবৎ আন্দোলন করছেন। চুড়াচাঁদপুরের সংঘাত ব্যাপক রূপ নেয়। ভ্যালি বা উপত্যকা অঞ্চলেও তার প্রভাব পড়ে। দ্রুত ইম্ফল পূর্ব-পশ্চিম কোংপাপকী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি সন্নিহিত জেলাগুলিও দাঙ্গাপ্রবণ হয়ে ওঠে। রাজ্য সরকার নিশ্চুপ। কিছুটা হত বিহ্বল আবার তারা যে, হিন্দু ধর্মের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় মেইতেইদের পক্ষে ছিল না, এমনও মনে হয় না। হিন্দু-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী বিজেপি।

এমত ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত হানাহানি চলে দীর্ঘ দশদিনেরও বেশি। সরকারি হিসেবে ৭০ জনেরও বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়। প্রায় ৯৫০০ মানুষ ভিটেমাটি হারা। বহু ঘর বাড়ি পুড়েছে। সরকারি সম্পত্তির বিনাশও নেহাৎ কম নয়। ডবল ইঞ্জিনের মূল প্রবক্তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে কর্নাটক রাজ্যে বিজেপি'র বিজয়রথ চালাতে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। ফিরেও তাকান নি মণিপুরের দিকে। দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত মণিপুর রাজ্যে মনযোগ দেবার বিষয়টি আদৌ গুরুত্ব পায় নি। অকর্মন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার পরিচালকবৃন্দ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অসহায় ভাবে দিল্লির দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। মানুষের প্রাণের কোনও মূল্যই নেই এইসব বর্বরজনোচিত রাজনীতির কারবারিদের। দেশের মানুষকে প্রকৃত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎকে বিদায়

জার্মানী একদা মোটরগাড়ির বিজ্ঞাপনে স্লোগান লিখত 'আর পারমাণবিক বিদ্যুৎ' নয়। কার্যতই গত ১৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখেই জার্মানী তাদের দেশের শেষ তিনটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর থেকে জার্মানী রিনিওএবল বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে।

কয়লাখনির অধিকার নিয়ে পাকিস্তানে খুনোখুনি

পাকিস্তানের দারা আদম খেক অঞ্চলে, অর্থাৎ পেশোয়ার থেকে ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে মারাট জেলায় সরকার কয়লাখনির সীমানা বদল করার পর সুন্নিমেল এবং জারখুন মেল উপজাতিদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলতে থাকে। গত সপ্তাহে কম করেও দুটি গোষ্ঠীর সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৫ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

ইউক্রেন বনাম রাশিয়ার যুদ্ধে উভয়পক্ষের বিপুল বিনিয়োগ

২০২২ সালের ডিসেম্বর মার্কিন সংসদ ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার অনুমোদন করেছে যার ৫৮ শতাংশই যুদ্ধখাতে বরাদ্দ হয়েছে। ২০২১ এর তুলনায় ৮ শতাংশ বেড়েছে। অথচ পরিবেশের ভারসাম্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা সমাধানে বরাদ্দ মাত্র ১.০৫ বিলিয়ন ডলার। লন্ডনের ওভারসীজ ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউটের সমীক্ষা অনুযায়ী মোট জাতীয় আয়, জনসংখ্যা এবং ক্রমবর্ধমান গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের নিরিখে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য আমেরিকার অনুদান হওয়া উচিত কম করেও ৪৩ বিলিয়ন ডলার। পৃথিবীর কার্বন ডাই অক্সাইড নিষ্ক্রমনে এগিয়ে রয়েছে চিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, রাশিয়া ও জাপান। অথচ প্রতিটি দেশই প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে গ্রীন হাউজ গ্যাস।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপাদনকারী ভারত ২০২২-২৩ এর বাজেটে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ রেখেছে মাত্র ৩০০০ কোটি টাকা, বাজেটের ০.১ শতাংশ মাত্র।

কিং চার্লসের অভিষেক এবং কোহিনূর ফেরত সম্পর্কিত বিতর্ক

কিং চার্লসের অভিষেকের দিন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে রানী ক্যামিল্লা কি কোহিনূর শোভিত মহারানী এলিজাবেথের মুকুটটি সেদিন পরবেন? বাকিংহ্যাম প্যালেস থেকে সরকারিভাবে নেতিবাচক উত্তর দেওয়া হয়। নেতিবাচক উত্তর সত্ত্বেও সেই চিরাচরিত প্রশ্নটাই আবার দেশ বিদেশে শোরগোল তুলেছে, ইংলন্ড কি কোহিনূর ফেরৎ দেবে? গ্রেট ব্রিটেন নিউজের ব্রেকফাস্ট নিউজে সঞ্চালক এই প্রশ্নটি যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। ভারতীয় বংশভূত দ্বিতীয় সঞ্চালক সরাসরি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে, তিনি ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যাহোক ব্রিটেনের প্রচারমাধ্যম কিন্তু সরাসরি ঘোষণা করেছে ভারত সরকার কোহিনূর সহ বহু মূল্যবান সম্পদ ফেরৎ দেওয়ার জন্য ব্রিটেনের উপর চাপ সৃষ্টি করছে বলে যে খবর হাওয়ায় ভাসছে, তা সম্পূর্ণই গুজব। ভারত সরকার ব্রিটেনের সংবাদ মাধ্যমের এই প্রতিবেদনের কোনো বিরোধিতা করে নি।

ভারতে গণতন্ত্রের সংকোচন ও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা

তুষার চক্রবর্তী

বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের এখন বেহাল দশা। যাঁরা এসব মাপজোক করেন তাদের হিসেবে ও পদ্ধতিতে অবশ্য কারচুপি না হলেও নানা কারসাজি থাকে। বিশ্বজুড়ে পুঁজির স্বার্থেই বিশেষ বিশেষ দেশের ওপর চাপ তৈরী করবার জন্যে এদের ব্যবহার করা হয়। যেমন গণতন্ত্রের দশা হিসেব করে বৃটেনের ইকনমিস্ট পত্রিকার একটি শাখা। এই শাখাটির নাম—ইকনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। গণতন্ত্র মাপবার আড়ালে অর্থনৈতিক গোয়েন্দাগিরি, অর্থাৎ—সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী বা বিনিয়োগের স্বার্থে যে এরা কাজ করেন তা বোঝবার জন্য তিলমাত্র বুদ্ধি খরচ করবার দরকার এ ক্ষেত্রে নেই। এদের স্থানাঙ্কে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দু দেশের গণতন্ত্রই কিন্তু পোকায় কাটা। ইংরেজিতে বললে flawed democracy। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর সময় জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজের ওপর নানা নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা হয়েছিল। তাতে গণতন্ত্র যে সংকুচিত হবে সেটা স্বাভাবিক। আশা করা হয়েছিল যে, এ সব বিধিনিষেধ ২০২১ সাল থেকে উঠে যাবার ফলে ২০২২ সালে বিশ্বে গণতন্ত্রের অনেকখানি প্রসার দেখা যাবে। বাস্তবে যা ঘটেনি। তার অর্থ—আজকের বিশ্বব্যবস্থায় গণতন্ত্রের অভূতপূর্ব সংকোচন ঘটছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যা কখনও দেখা যায় নি। আবার মিডিয়া, অর্থাৎ সংবাদপত্র ও সম্প্রচার, এককথায় যাকে আমরা বলি সংবাদমাধ্যম, তার স্বাধীনতাও সংকুচিত হতে দেখা যাচ্ছে।

যেহেতু, সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের পাহারাদার হিসেবে দেখা হয়, তাই গণতন্ত্রের সংকোচনের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার বিসর্জন স্বাভাবিক। বিশ্বে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার হিসেব ও সূচি তৈরি করে রিপোর্টার উইদাউট বর্ডারস নামে একটি ইউরোপীয় অ-সরকারি সংস্থা। এদের হেডকোয়ার্টার প্যারিসে, সংস্থাটি তৈরি হয় ১৯৮৫ সালে। NATO'র কণ্ঠস্বর হিসেবেই যাকে ধরে নেওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ''গণতন্ত্র রক্ষার'' অনুদান যাদের ঝুলিতে, এবং কিউবার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যেও যাদের সক্রিয় হতে দেখা যায়। ইউরোপের বাইরে এদের কোনো অফিসও নেই। কিন্তু, এ সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, সংবাদপত্রের ওপর রাষ্ট্রীয় চাপের খানিকটা প্রতিফলন এদের তালিকায় প্রতিফলিত হয়। এদের সাম্প্রতিক তালিকায় ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গতিপ্রকৃতির ছবিটি ফুটে উঠেছে। গত কয়েক বছরে যা পেছনের দিকে এগোচ্ছে। এ বছর ১৮০টি দেশের তালিকায় ভারতের স্থান ১৫১তম স্থানে নেমে গেছে। ভারতে মিডিয়া ও সংবাদপত্রের জগতে ব্যাপারটা কিভাবে ঘটছে সেটা তাই খুঁটিয়ে দেখা দরকারি।

ভারতে মুদ্রিত প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের এখন বেহাল দশা। আবার, ইন্টারনেট, মোবাইল মারফৎ ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসআপ, ইউটিউব ইত্যাদি পরিসেবার মাধ্যমে সামাজিক সংবাদমাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়া নামের সংবাদ পরিবেশন ও মতপ্রকাশের একটি নতুন সম্ভাবনার দিকও উন্মোচিত হয়েছে। গণতন্ত্র রক্ষা ও প্রসারে তা কোনো কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে কিনা সেই প্রশ্নও আলোচনায় উঠে আসবে।

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে যাকে সচরাচর উল্লেখ করা হয়, এতদিন সেই সংবাদ-মাধ্যমের কাজ ছিল গণতন্ত্রের আপদবিপদের পূর্বাভাস দেওয়া। উপসর্গ বা রোগলক্ষণ ও রোগকে চিনিয়ে দেওয়া, যাতে গণতন্ত্রের বাকি তিনটে আসল স্তম্ভ সজাগ হতে পারে। নিরাময়ের ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু, যে ধনকুবেরতন্ত্র এখন দুনিয়া জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে আছে—তারা জ্ঞানপাপী। অসাম্য কমাবার বদলে বৃদ্ধির দিকেই তাদের ঝোঁক। সুতরাং, তারা বিপদ জানার বদলে— বিপদসংকেত জানান দেবার যন্ত্রটাকেই, দখল করা, বিগরে দেওয়া ও বাতিল বা অকেজো করার পথ বেছে নিয়েছে। ফলে, এককথায় ঘটছে গণতন্ত্রের চতুর্থস্তম্ভের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।

বিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে বিশ্বায়নের নামে বিশ্বব্যাপী সমাজ পরিবর্তন এবং পুনর্গঠনের যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল তাতে মিডিয়াকে এক নতুন ও অতি-সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেল। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এই তিন দিকেই ছিল তার প্রভাব। আগের জমানায় মিডিয়া এক একটা নির্দিষ্ট পরিসরে, স্ব-আরোপিত গন্ডির মধ্যে থেকে কাজ করত। হঠাৎ, কোনো এক অদৃশ্য হাতে সেই সব গন্ডি যেন মুছে ফেলা হলো। রাজনীতির অন্দরমহলে ঢুকে পড়ল ক্যামেরা। তা ছাড়া, মিডিয়ার একদিকে শুরু হলো বৈভব ও বিলাসের সীমাহীন প্রদর্শন; অন্যদিকে দুর্নীতি, মিথ্যা, হিংসা, যৌনতা, অপরাধ—যা যা লজ্জাজনক বলে মিডিয়ায় বহুলাংশে পরিহার করা হতো বা রেখেঢেকে দেখানো হতো—শুরু হলো তার খুল্লমখুল্লা প্রদর্শন, উপভোগ। তার কয়েক দশক পরে এখন বোঝা যাচ্ছে যে লাজুক-ধনতন্ত্র থেকে নির্লজ্জ ধনকুবেরতন্ত্রের আবির্ভাব সুসহ করার জন্যেও হয়ত এই মিডিয়ার এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল।

অর্থনীতিতে সংবিধানে উল্লিখিত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ তৈরির অঙ্গীকার নীরবে পরিত্যাগ করে ভারত তখন ওয়াশিংটন সহমত্যের পথে চলছে। এই পথে দেশকে ঠেলে দিয়েছে ভারতের শাসকশ্রেণি। রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক ক্ষমতার অধিকারী রাজনৈতিক নেতারাও তৃষ্ণার্ত চাতকের মত মার্কিন ও তার সাগরেদদের কর্পোরেট পুঁজির মুখাপেক্ষী। যা সবার আগে বদলে দিচ্ছিল ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতির সাজানো বুলি। ইংরেজিতে যাকে বলে rhetoric। আর, দেশের যাবতীয় জনসম্পদ বিক্রি করে, বাণিজ্যপ্রভুদের হাতে জলের দামে তুলে দিয়ে, যে সাজানো উন্নয়নের স্বপ্ন সে সময় সাধারণ নাগরিকদের দেখানো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল, ভারতীয় মিডিয়াকে সেই কাজেই নিযুক্ত করা হয়েছিল। ফোর্থ এস্টেটের উন্নয়নের ফেরিওয়ালার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার এটাই ছিল প্রেক্ষাপট। এটাকেই বলা যেতে পারে মিডিয়ার পরিবর্তন। বিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বের আগে ভারতের মিডিয়া বিজ্ঞাপন থেকে আয় করত বটে, তবে তার সঙ্গে সংবাদপত্রের সংবাদ, সম্পাদকীয়, অতিথি সম্পাদকীয় ইত্যাদির সংযোগ এমন নিবিড় বা চুক্তিবদ্ধ ছিল না, যা একুশ শতকে দেখা যাচ্ছে।

মিডিয়া, অর্থাৎ প্রচলিত ছাপানো সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, টেলিভিশন সম্প্রচার এখন একুশ শতকে আর তেমন লাভজনক নয়—বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লোকসানের ব্যবসা। অথচ সে সব মিডিয়া এখন কর্পোরেট প্রভুরা প্রবল উৎসাহে চড়া দামে কিনছে। প্রণয় রায়ের NDTV-র কথাই ধরুন। শেয়ার বাজারের সুযোগসন্ধানী হিসেবী-কারবারি (কেতাবি ভাষায় যাকে বলে short seller) হিন্ডেনবার্গ-রিসার্চ কোম্পানির টর্পেডোর নিশানা হবার আগে বিপুল পরাক্রমী কর্পোরেট আদানি এন্টারপ্রাইজ যাকে কিনেছে, তাও তো ধুঁকছিল বিপুল লোকসানে। যে NDTV ৫৬০ কোটি টাকা আয় করেছিল ২০১৬ সালে, গত বছর, অর্থাৎ ২০২২ সালে, তার আয় বাড়ার বদলে কমে দাঁড়ায় ৩৯৬ কোটি। মিডিয়া আয় ব্যয় বিষয়ে সরকারী CARG রিপোর্টে গত পাঁচ বছরে NDTV র আয় একনাগাড়ে গড়ে বছরে চার শতাংশ করে কমেছে। কেন? সেটাও বোঝা কঠিন নয়। এরমধ্যে NDTVর (যা আসলে একটা দৃষ্টান্ত) মানের উন্নতি অবনতি মোটেই জড়িত নয়।

আসলে, টাটকা খবর জানতে মানুষকে এখন আর পয়সা খরচ করতে হয় না। ছাপানো সংবাদপত্রে ২৪ ঘণ্টার বাসি খবর পড়া যেমন বর্জন করেছে, তেমনি বাড়িতে ফিরে TVর সামনে বসে খবর জানার অভ্যাসটাও চলে যাচ্ছে। যে যার পছন্দের আগ্রহের খবর ও সাধারণ খবর দুটোই মুহুর্মুহু পেয়ে যাচ্ছে—মোবাইলে। সোস্যাল মিডিয়া, নানা গ্রুপ, মন্তব্য সহ প্রত্যেকের আগ্রহের বিষয়ে তাকে অবহিত করছে। নিজের সোস্যাল নেটওয়ার্কে চেনা অচেনা বন্ধুদের কাছে থেকেই নয়—কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার হাত ধরে তার আগ্রহের খবর ও তার নিজস্ব পছন্দের বা আগ্রহের মতামত ম্যাজিকের মতো পাতে পাতে পরিবেশিত হচ্ছে। ব্যক্তি নিজেও সেসব যেমন ফরোয়ার্ড করছে তার বৃত্তে থাকা অন্যদের, তেমনি তার অগোচরে সেই কাজ যন্ত্র বা মেশিন নিজেও করছে। ব্যক্তির এক শতাংশ ঝোঁক— আরো বিবর্ধিত হয়ে সমাজ-নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগছে।

আদানির আগে ভারতে লোকসানের মিডিয়া লোভনীয় দামে কেনবার দৃষ্টান্ত রেখেছে আরেক ধনকুবের মুকেশ আম্বানি। NEWS-18 সহ এই মিডিয়া গ্রুপের ঝুলিতে থাকা ৩০টির বেশি চ্যানেল কিনে ভারতীয় মিডিয়াকে প্রায় কব্জা করে নেয় প্রধানমন্ত্রী মোদি ঘনিষ্ঠ আম্বানি সাম্রাজ্য। গোদী মিডিয়া বলে একটা তির্যক শব্দবন্ধ চালু হয়ে যায়। আম্বানির এই মিডিয়া গ্রুপে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার ভারতীয় সম্প্রচার, জাতীয় সম্প্রচার ও আঞ্চলিক সম্প্রচার সবই ছিল। আম্বানি হাতে পেয়ে যায় CNN, CNBC, NEWS-18, ETV র এক গুচ্ছ চ্যানেল। আরেক মিডিয়া মালিক অরুন পুরি তার আগেই মোদি ভক্তের দলে নাম লিখিয়ে গোদী মিডিয়াকে সার্থকনামা করে তুলছিল। সুতরাং, আদানির গোদী মিডিয়ায় প্রবেশ ছিল শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। গোদী মিডিয়া এই নব-পরিভাষায় প্রকট এই মিডিয়া কেনার এক প্রধান উদ্দেশ্য। লাভ-লোকসান এখানে মিডিয়ার আয়ব্যয়ের মুদ্রার অঙ্কে ধরা পরবে না। রাজনীতির হিসেবটাই প্রধান। হিন্দিতে গোদ কথাটার অর্থ কোল, যা আদরের সন্তানের ভরসা পাবার সেরা জায়গা। গোদী-মিডিয়া কথাটার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নাম ও ভরসা অর্জনের স্থান, এই দুয়ের নিদারুণ মেলবন্ধন, চিরসরস ভারতীয় রসিকচিত্তের পরিচয় বহন করছে।

শুধু আম্বানি আদানি নয়, মিডিয়া বাজারে কেনাবেচার চালচলন একুশ শতকে আমূল বদলে গেছে। চিরাচরিত পারিবারিক মিডিয়া ব্যবসার মৌরুসিপাট্টা এখন কোণঠাসা। বাণিজ্যপতিদের সংঘ FICCI র হিসেবে দেখাচ্ছে মিডিয়া বেচাকেনা ও সংযুক্তি, অর্থাৎ একচেটিয়া কেন্দ্রীভবন, প্রতি বছর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। ২০১৯ সালে বাণিজ্য পরিভাষায় মিডিয়ার নথিবদ্ধ মার্জার এন্ড একুইজিসন (M&A) ছিল ৬৪টি। টাকার অঙ্কে দশ হাজার একশ কোটির। ২০২০ তে ঘটল ৭৭টি, আর ২০২১-এ ১১৮টি। টাকার অংকে ২০২১ সালে যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭,২০০ কোটির কেনাবেচায়। এদের অর্ধেকই সম্প্রচার অর্থাৎ TV ইত্যাদি। ভারতে মিডিয়ার মানচিত্র ও স্থানচিত্র (ল্যান্ডস্কেপ) দ্রুত ও ঘন ঘন বদলে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ছবিটাও এইরকম। ভারতীয় ধনকুবেরদের চরিত্র বিশ্বের ধনকুবেরদের সঙ্গে একসুরে বাঁধা। যেমন ই-কমার্সের শীর্ষে থাকা আমাজনের মার্কিন মালিক জেফ বেজোস কিনেছেন ওয়াশিংটন পোস্ট। বিল গেটস হয়েছেন BBC র পৃষ্ঠপোষক, বিলেতের গার্ডিয়ান, টেলিগ্রাফ, ডেইলি মেল, ফিনান্সিয়াল টাইমস, মার্কিন মুলুকের আল জাজিরা সবেতেই বিল গেটসের শ্বেতশুভ্র হাতের থাবা। যে মিডিয়ার ব্র্যান্ড ভ্যালু যত বেশি তা নিয়ে ততো ধনকুবেলদের মারামারি, কাড়াকাড়ি।

এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটা তথ্য মাথায় রাখা দরকার। প্রথমত, ভারত কিন্তু মিডিয়ার উপস্থিতিতে বিশ্বের শীর্ষে। বিশ্বের বাকি সবদেশের মিডিয়াকে একপাল্লায় রাখলে, ভারতে মিডিয়ার পরিসর ও বৈচিত্র তাদের থেকে ভারী। যা আনুমানিক নয়, নিখুঁতভাবে যাচাই করা যায়। মিডিয়া পঞ্জিকরণ অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন দেখলেই তা বোঝা যাবে। ভারতে রেজিস্টার করা শুধু পত্রপত্রিকার সংখ্যাই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের বেশি। ইংরেজ শাসনে, স্বাধীনতার আগে, যে সংখ্যাটি ছিল মাত্র ২০০র কাছাকাছি। স্বাধীনতার পর সারা ভারতে সেই সংখ্যা ক্রমাগত আশ্চর্য্যভাবে বেড়েছে। যার বৈচিত্র অপরিসীম। পশ্চিমের কোনো দেশ এখন কল্পনাও করতে পারে না। ভারতে জনমত এ সব পত্রপত্রিকার মধ্যে দিয়ে নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

দ্বিতীয়, ভারতীয় মিডিয়া স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে জানে। ভারতে ইন্দিরার ঘোষিত ইমার্জেন্সি বা জরুরি অবস্থা সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ জারি করে এদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছিল। সেই কারণে, জরুরি অবস্থা তুলে নেবার পর তারা সরব হয়েছিল সর্বাগ্রে। ইন্দিরাকে নির্বাচনে পরাস্ত করা শুধু নয়—কংগ্রেসকে প্রায় দেশ থেকে মুছে দেবার পেছনে ভারতের বড় মিডিয়া নয়—এই বিপুল সংখ্যক ছোট পত্রপত্রিকার বিরাট ভূমিকা ছিল। সুতরাং, মিডিয়ার মৃত্যু, অপমৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে পশ্চিমে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়াণলেখ বা অবিচুয়ারি লিখে ফেলা যতটা সহজ—ভারতে তা নয়।

—এরপর ৪ পাতায়

ভারতে গণতন্ত্রের সংকোচন ও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা

৩-এর পাতার পর—

ভারতে মিডিয়ার বিপদ এই শিরোনামে যদি সেমিনার বা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে সব বক্তা বা আলোচক এই মুহূর্তে মূল বিপদ হিসেবে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোদি, অর্থাৎ গোদী মিডিয়া, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও ভারতীয় জনতা পার্টির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির কথাই বলবেন। কিন্তু, তা ভারতে মিডিয়ার একমাত্র বিপদ নয়। আর এমনও নয়— যে এই দলটি নির্বাচনে পরাস্ত হলেই ভারতে মিডিয়ার বিপদ কেটে যাবে। ভারতে মিডিয়ার পরিসর যেমন ব্যস্ত ও বহুতর, তেমনি সমস্যাও বৈচিত্রময়।

মিডিয়ার সংকট বলতে যদিও রাজনৈতিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে সবচাইতে বেশি আলোচনা হয়, মিডিয়ার আরো বুনিয়াদী সংকট বা দুর্বলতা, মিডিয়ার আর্থিক দিক। অর্থাৎ, আয়ব্যয়ের অসঙ্গতি। এখন মিডিয়ার লগ্নি ও আয় বস্তুত আসছে মিডিয়ার বাইরের অনন্য কোনো উৎস থেকে। মিডিয়া আত্মনির্ভর নয়, কেননা পাঠকের কাছে যে মূল্যে তা বিক্রি হয় তা মিডিয়ার খরচের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। দৈনিক সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের ক্ষেত্রে যেই ফাটল সবচেয়ে গভীর। ভারতে জাতীয় বা আঞ্চলিক লক্ষাধিক বিক্রি হয় এমন সংবাদপত্রের এক কপির দাম একটা সিগারেটের চাইতেও কম। আবার এত সস্তা হলেও তার বিক্রি কমছে—দামের নয়, মানের জন্য।

কি এর কারণ? ভারতের সংবাদপত্রের জগতের রাঘব বোয়াল বেনেট কোলম্যান কোম্পানির টাইমস অব ইন্ডিয়া গ্রুপ ও এই সর্বনিম্ন দামের ব্যাপারটা বেঁধে রাখার আসল পান্ডা। অন্য বড় মাপের খেলুড়েরাও এই খেলা খেলছে। এই সর্বনিম্ন দাম রাখবার খেলাটাকে বাণিজ্যের ভাষায় বলা হয়—predatory pricing বা আঘাতকারী দাম। এই কৌশলে, নিজের সাময়িক ক্ষতি করে, প্রতিযোগীকে দুর্বল করে, শিকার করা হয়। ক্ষতি সামলানো হচ্ছে নিজের ট্যাঁকের জোরে। ইংরেজিতে বলা হয় deep pocket । আর এই কারণেই প্রতিযোগীকে খতম করে তাকে দখল করে নিজেকে বাড়ানে হয়। সাবান, ডিটারজেন্ট, দাঁদের মাজন বা টুথপেস্ট, বিস্কুট এ ধরনের পণ্য বিক্রিতে আগে এই বাণিজ্য নীতি প্রযুক্ত হতে দেখা যেতো। বিশ্বায়নের পর থেকে এই নীতি মিডিয়ার জগতে দেখা দিয়েছে। মিডিয়ার সস্তার বাজারে, মুনাফা দূরস্থান টিকে থাকার খরচ তোলাই দুষ্কর।

ভারতে আশ্চর্যজনকভাবে অজস্র ছোট ও আঞ্চলিক সংবাদপত্র এরমধ্যেও টিকে আছে ভিন্ন চরিত্রের গুণে, কম খরচে, জনস্বার্থের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু, তাদের বেড়ে ওঠার কোনো সুযোগ নেই। স্বাধীনতার পরে দীর্ঘদিন অন্য নানা সমস্যা থাকলেও—এই সমস্যা ছিল না। মিডিয়া নিজের খরচ বিক্রি থেকে মেটাতে পারে না বলে তার মাথা উঁচু করে বাঁচবার উপায় নেই। আবার একই বাজারে, দাম বাড়ালে, ক্রেতারা সেই পত্রিকা কিনবে কেন?

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এই আয়ব্যয়ের বিশাল অসঙ্গতি মেটাতে অর্থনীতির ছিদ্রপথে নর্দমায় গিয়ে মিশছে। গদিতে বসে থাকা সরকারের খারাপ কাজকে আড়াল করে, নেতা বা সরকারের সুখ্যাতি প্রচার করলে সরকারি বিজ্ঞাপনের বন্যা দিয়ে মিডিয়ার ক্ষতি মিটিয়ে দেয়া হয়। সেটাই টিকে থাকার দস্তুর। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রায় ১০০ কোটি ডলার পত্রিকা ও জাতীয় টেলিভিসনে বিজ্ঞাপনের পেছনে ব্যয় করছেন। রাজ্য সরকারগুলি, যেমন এ রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সমান তালে মিডিয়া বিজ্ঞাপনে জলের মত অর্থ খরচ করছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার যদি এই সব বিজ্ঞাপন বন্ধ করে—এই সব প্রথম সারির মিডিয়া এক মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। সরকারের দাক্ষিণ্যে আজ তারা টিকে আছে। অথচ এরা মাঝে মাঝেই বিমূর্তভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলে, যা এদের গলায় মানায় না।

এই অবস্থা একুশ শতকে শুরু হয়েছে এবং এখন দ্রুত বাড়ছে। সরকার বদল হলেও এই সমস্যা মিটবে বলে মনে হয় না। সুতরাং, মিডিয়ার স্বাধীনতা বিপন্ন—কিন্তু পেছনের পটভূমি অর্থনীতির মধ্যে লুকিয়ে আছে।

ভারতে মুদ্রণের চাইতেও টেলিভিশন বা সম্প্রচারের স্বাধীনতা আরো বেশি বিপন্ন। কেননা, টেলিভিশন সে ভাবে কখনো স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি। রেডিও ও টেলিভিসন সম্প্রচার ছিল সরকারের হাতে, আমলাদের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সরকারি পরিকাঠামোর মধ্যে—বেসরকারি মিডিয়াকে ১০ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা সময় কিনে প্রোগ্রাম বুলেটিন ইত্যাদির জন্য দেওয়া শুরু হয়। সেখানেও আমলার অনুমোদন দরকার হত। এবং, বিজ্ঞাপন নির্ভরতা ছিল সে সময়ের সংবাদ মাধ্যমের চাইতে অনেক বেশি। সেই অবস্থা একটু একটু করে বদলিয়েছে। কিন্তু, সেখানে শুরু থেকেই স্বাধীনতার স্বাদ অত্যধিক ফিকে। আয় বৃদ্ধিতে, সরকারের দাক্ষিণ্য ছাড়াও লোভ, ভয়, কুসংস্কার, যৌনতা ইত্যাদির অতিমাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে। বেসরকারি টেলিভিসনের নিজস্ব সম্প্রচার শুরু হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। গত বছর, ২০২২ সালে ৩৯২টি নতুন চ্যানেল সম্প্রচার শুরু করেছে। কিন্তু, সোস্যাল মিডিয়া অর্থাৎ স্মার্টফোন প্রথম সম্প্রচারের বন্ধন যেন সত্যিই খুলে দিল। আপসহীন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে দেয়ালগুলি আর সেভাবে রইল না।

এই পরিস্থিতিতে ভারতের আম জনতা যেন ক্রমশ হাতে তুলে নিচ্ছে মোবাইল।

কম করে ৭০ শতাংশ ভারতীয় নাগরিক এখন টেলিভিসন দেখছেন স্মার্টফোনে। তারাই টেলিভিশনের মূল উপভোক্তা। তারাই টার্গেট। ভারতে প্রায় ৬০ কোটি স্মার্টফোন ঘুরছে হাতে হাতে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী আরো বেশি, অর্থাৎ ৭০ কোটি। মানে অর্ধেক ভারতীয়ের কাছে এটাই প্রধান মিডিয়ার জানালা। সুতরাং, ভারতের এই মিডিয়ার বাজার দুনিয়ার শীর্ষে। মিডিয়ার সুযোগ তাই আজ অসীম। এখানে স্বাধীনতা অবশ্যই সবচাইতে বেশি। ভারতের সেরা সাংবাদিকেরা এখানে নিজস্ব চ্যানেল ও সম্প্রচার নিয়ে নেমে পড়েছেন। আবার নাগরিকেরা তুলে দিচ্ছেন ছবি, ভিডিও, রিপোর্ট, মতামত। যা এ দেশ ইতিপূর্বে দেখেনি। এ যেন এক নতুন জগৎ, যার নিয়ম কানুন এখনো ব্যবহারকারীদের অজানা অচেনা। যা ক্রমশ একটা আদল গ্রহণ করছে। এখানে মতপ্রকাশ তাই বাধাহীন। যদিও রাজনীতির পান্ডারা এখানে প্রযুক্তির সাহায্যে মিথ্যাকে সত্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যে কারণে, আজ পুঁজি ও তাদের স্বার্থবাহী রাজনীতিক দলের মিথ্যা সংবাদ বা ফেক নিউজকে হাতিয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়াকে কলুষিত করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পরেছে। সোশ্যাল মিডিয়াকে যদি গণতন্ত্রের রক্ষা ও প্রসারে অংশ নিতে হয়— তা হলে তার সামনে সব চাইতে বিরাট চ্যালেঞ্জ হল ফেক নিউজের মোকাবিলা করা।

তবু, সোশ্যাল মিডিয়ার সবচাইতে বড় ইতিবাচক দিক, এখানে নিরপেক্ষতার ভান নেই। আম জনতার কাছে তা নিরর্থক। তা সৌখিন ধান্দাবাজি। আমজনতার মন এই প্রথম সোশ্যাল মিডিয়া ও তার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, ব্যবহারকারীর আচরণ ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সরাসরি সমাজবিজ্ঞানীদের নাগালে আসছে। ক্রমশ খুলে যাচ্ছে রাজনীতি ও রাজনীতি বিজ্ঞানের এক নতুন জগৎ।

তবে আসন কথা হলো—বিশ্বের সর্বত্রই গণতন্ত্রের এখন কালবেলা। ধনকুবেরতন্ত্রের চাপে গণতন্ত্রের সব স্তম্ভই বলুন বা এস্টেট, এখন নড়বড়ে, ভগ্নদশায়। চতুর্থ ভেঙ্গেছে, ভাঙ্গছে এটা যত স্পষ্ট—পঞ্চম যে তাকে সুস্থায়ী করবে সেই ভরসাও এক্ষুনি দেওয়া যাচ্ছে না।

নানুরে বামগণতান্ত্রিক মঞ্চের নেতৃত্বে ডেপুটেশন

গত ৬ মে বীরভূম জেলার নানুর ব্লকে বাম ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে

১. পুলিশ প্রশাসনকে দলদাস নয়, নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

২. নানুর থানা এলাকায় মজুত থাকা সমস্ত বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে হবে।

৩. আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিরোধীদের নমিনেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সকল গ্রামছাড়া বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গ্রামে ফেরাতে হবে এবং তাদের গ্রামে থাকার সমস্ত রকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে, এই দাবিতে নানুর থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উক্ত ডেপুটেশনে আর এস পি-র পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দলে উপস্থিত থাকেন নানুর লোকাল সম্পাদক কম. সিরাজুল হক। ডেপুটেশনকে সামনে রেখে যে প্রতিবাদ সভা হয় সেখানে আর এস পি'র পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কম. রঞ্জিত মজুমদার। তিনি তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানা রকম দুর্নীতি নিয়ে সরব হন এবং সরকারের কড়া ভাষায় তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার সুকৌশলে সিলেবাস বেড়ে যাওয়ার নামে দশম শ্রেণির জীবন বিজ্ঞান থেকে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও ইতিহাস থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের অধ্যায় বাদ দিয়ে নতুন পাঠ্যবই প্রকাশ করছে, যাতে আগামী প্রজন্ম বিজ্ঞান মনস্ক শিক্ষায় শিক্ষিত না হতে পারে এবং ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস না জানতে পারে, সেই ব্যবস্থা করছে বলে উল্লেখ করেন। রাজ্যের বর্তমান সরকার গরু, বালি, কয়লা, পাথর, চাকরি চুরি করে যোগ্যদের কলকাতার রাজপথে বসিয়ে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে অযোগ্যদের চাকরি বিক্রী করার কথা বলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে লড়াই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান রেখে সকলকে বিপ্লবী ও রক্তিম অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সুষ্ঠু পঞ্চায়েতে নির্বাচনের দাবিতে কীর্ণাহার থানায় ডেপুটেশন

১. পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

২. শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিরোধীদের নমিনেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. লাভপুর ব্লকের প্রত্যেক এলাকায় মজুত রাখা বা থাকা সকল বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে হবে।

এই দাবিতে কীর্ণাহার থানায় আর এস পি, সি পি আই এম ও কংগ্রেস-এর পক্ষ থেকে দাবি পেশ এবং বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কমরেড রঞ্জিৎ মজুমদার। তিনি তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নানা দুর্নীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, নারী নির্যাতন নিয়ে দুই সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং বাংলা সহ সারা দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নারী সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রত্যেককে নিজ নিজ এলাকায় সতর্ক থেকে কাজ করার কথা বলেন প্রতিটি বক্তা।

জলপাইগুড়িতে রবীন্দ্রজয়ন্তী

জলপাইগুড়ি ক্রান্তি শিল্পী সংঘের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করা হলো কম. ননী ভট্টাচার্য্য মঞ্চে। এই কর্মসূচিতে ছোট বড় শিল্পী সমন্বয়ে কবিতা, আবৃত্তি, নৃত্য, সঙ্গীত ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। সকাল ১০টা থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বেলা ২.৩০ পর্যন্ত এক মনগ্রাহী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

গত ৫ মে রঘুনাথ মূর্মুর জন্মদিবস উদ্‌যাপন

আদিবাসী সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ মহান রঘুনাথ মুর্মুর জন্মদিন সর্পলেহনা-আলবাঁধা পঞ্চায়েতের সর্বানন্দপুর গ্রামে শোভাযাত্রা সহ যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকেন কম. শশাঙ্ক মণ্ডল। এছাড়া উপস্থিত থাকেন গ্রামের একাধিক বিশিষ্ট আদিবাসী জন ও মহিলা যুব এবং ছাত্র-ছাত্রী।

কলকাতায় ছাত্র যুবদের মিছিল ও ডেপুটেশন

রাজ্যব্যাপী দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিরুদ্ধে শিক্ষাক্ষেত্রে নয়া শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে শিক্ষাকে ধ্বংস করার বিরুদ্ধে ও রাজ্যে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আর এস পি'র ছাত্র, যুব এবং মহিলারা রাজপথে। পি এস ইউ, আর ওয়াই এফ ও নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের ডাকে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন এবং সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এন্টালি মার্কেট পর্যন্ত মিছিল করে মৌলালী মোরে প্রতিবাদ সভা করে।

আর এস এস প্রতিরোধে বিকল্প আর্থ-সামাজিক অনুশীলন

মৃন্ময় সেনগুপ্ত

বিজেপি'র রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন নিয়ে রাজ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিতর্ক সবসময়ই কাম্য। বিজেপি তথা আর এস এসের দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বমানবতার দর্শনকে যে মেলানো যায় না, তা সকলেই জানেন। তাঁর দেশ ভাবনা, উন্নয়ন ভাবনা, শিক্ষা ভাবনা, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর মত আর এস এস বা যে কোনো ধর্মীয় মৌলবাদেরই সম্পূর্ণ বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ মুক্ত চিন্তা, বৈচিত্রের সাধক। রবীন্দ্র সাহিত্য, তাঁর কর্মকাণ্ড ছিল সেই সাধনার অঙ্গ। আর এস এস চায় উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মান্ধতা, বিদ্বেষপূর্ণ, একমাত্রিক সমাজমানস। তবুও, আর এস এস রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করে, বা বলা ভালো করতে বাধ্য হয়। যেমন সুভাষচন্দ্র বসু, এমনকী ভগৎ সিংকেও তারা স্মরণ করে। মনীষীদের ব্যক্তিপুজো করে, তাঁদের জীবন দর্শনকে বিকৃত করে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানো ধর্মীয় মৌলবাদের বৈশিষ্ট্য। বিজেপি তথা আর এস সেই কাজই অতি নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছে।

আর এস এসের এই কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রতিবাদ করা তাই মুক্ত চিন্তার উপাসকদের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু, প্রশ্ন হল আর এস এস এই কর্মসূচি নেওয়ার সাহস পেল কোথা থেকে? মুক্ত চিন্তা, বিজ্ঞানমনস্ক সংস্কৃতির চর্চা যদি নিষ্ঠার সঙ্গে করা যেত, তাহলে এই সাহস তারা পেত না। বিজেপি'র এই কর্মসূচির পালটা কর্মসূচি বা প্রতিবাদের কথাও কেউ কেউ ভাবছেন। তাতে বিজেপি'রই জয় হবে। রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন যদি বিজেপি'র সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে করতে হয়, তাহলে তার থেকে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। লোকায়ত রবীন্দ্রনাথকে আমরা বহুকাল আগেই বিসর্জন দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ এখন কুলীন। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ ও প্রাতিষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক কর্মীদের (স্বঘোষিত সেলিব্রিটি) আভিজাত্যের প্রতীক। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলঘরে বা অভিজাত স্থানে রবীন্দ্র চর্চা আবদ্ধ। অভিজাতের রবীন্দ্র চর্চা নগর বা জেলা সদরে জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। জাঁকজমক ক্রমশ বাড়ছে। আর তার সঙ্গেই বাড়ছে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিচ্ছিন্নতা।

রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীই হোক বা যে কোনো মনীষীদের স্মরণই হোক, প্রাতিষ্ঠানকতা ও আভিজাত্যের বেড়াজালে সীমাবদ্ধ। সরকার বা বড় প্রতিষ্ঠান, শাসক দলের প্রচারের হাতিয়ার। সরকার তথা শাসকের প্রসাদধন্য সেলিব্রিটিরা যাকে কেন্দ্র করে নিজেদের আখের গোছান।

শাসক দলের মাতব্বর নিজেদের ঢাক পেটান। তাঁদের কাছে ধর্মীয় উৎসব পালনের সঙ্গে রবি ঠাকুরের জন্মদিন পালনে কোনো পার্থক্য নেই। নিজেদের, তাঁদের নেতা-নেত্রীদের ছবির মাঝে স্থান পান মনীষীরা। বারো বছর ধরে মনীষীদের প্রতি এই অপমান দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অভ্যস্ত হয়ে গেছি ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি আর রাষ্ট্রযন্ত্রের মেলবন্ধনে। সমালোচনা যে হয় নি, তা নয়। কিন্তু এর বিকল্প সাংস্কৃতিক - সামাজিক অনুশীলনের চেষ্টা হয় নি। বরং, মনীষীদের চর্চায় বামেরাও বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে মাতামাতিতেই মজেছেন। সেই বিখ্যাত ব্যক্তিরা কত আপন তার প্রদর্শনে মেতেছেন। সেলিব্রিটিরা যুগের ধর্মে ডিগবাজি খেয়ে রাজনৈতিক অবস্থান বদলালে হা হুতাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে এলাকার অনুষ্ঠান সবেতেই এই আভিজাত্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। নিচের তলায় কাজ করা বাম কর্মীর সৃজনশীল মনন। আর এস এস তথা মৌলবাদের কাছে এর থেকে আদর্শ পরিবেশ আর কী হতে পারে?

বাংলার শহর-গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী পালন, বিদ্যাসাগর বা নেতাজীর জন্মদিন পালনের রেওয়াজ বহুকালের। কিন্তু, এখন তা প্রায় অবলুপ্ত। সেসব অনুষ্ঠানে পাড়ার সবাই নিজেদের মতো করে অংশ নিতেন। সর্বজনীন সেই অনুষ্ঠানের গুণমান নিয়ে অনেকে নাক কুঁচকোতেই পারেন, কিন্তু সামাজিক সেই অনুশীলন ছিল আমাদের জীবনের অঙ্গ। এলাকায় এলাকায় ছিল পরিবেশ ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব। পাড়ার ক্লাবের সাংস্কৃতিক বা ক্রীড়া অনুষ্ঠানে সবাই অংশ নিতেন। এলাকার বামপন্থী কর্মীরাও এইসব অনুষ্ঠানে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। এখন স্বতঃস্ফূর্ততার স্থান নিয়েছে জৌলুস। গণ পরিসরের স্থান নিয়েছে প্রাতিষ্ঠানিকতা। অর্থের দাপট বেড়েছে। তাকে কেন্দ্র করে বেড়েছে প্রতিপত্তি প্রদর্শনের ইতরামো। নয়া উদারনীতি বদলে দিয়েছে আমাদের সংস্কৃতি রুচিবোধ। সবাই মিলে বাঁচার কথা ভুলে আমরা পণ্যমোহে আবিষ্ট। বামেরা এই আক্রমণের মোকাবিলায় বিকল্প সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে নি। ঘুম ভেঙে উঠে দুয়ারে আর এস এস দেখলে, মনীষীদের হাইজ্যাক হতে দেখলে চমক ভাঙে। কিন্তু, প্রতিবাদ বা পালটা কর্মসূচি নিয়ে তার মোকাবিলা করা যায় না।

মনীষীদের জীবন চর্চা যত গণ পরিসর থেকে দূরে সরেছে, তত চটুল সংস্কৃতি, ধর্মীয় সংস্কৃতি সেই স্থান দখল করেছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান আগেও হত। কিন্তু, তাকে ঘিরে পাড়ায় পাড়ায় আড়ম্বর, প্রতিপত্তি প্রদর্শনের অশ্লীল প্রতিযোগিতা চলত না। বিজেপি'র রাম নবমীর পালটা তৃণমূলের হনুমান জয়ন্তীর দাপাদাপি হত না। আমরা বামেরা যদি বিকল্প নির্মাণের অনুশীলনকে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে দূরে সরিয়ে না রাখতাম, তাহলে মৌলবাদীদের ঠাঁই হত না।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনেই বিকল্প নির্মাণের অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এসবের মধ্য দিয়ে মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিলেন। গুপ্ত বিপ্লবী দলগুলি এলাকায় এলাকায় ক্লাব, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি গড়ে তুলতেন। যুব সমাজ তার মাধ্যমে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হতেন। আবার ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দেওয়াও যেত। অনুশীলন সমিতি নানা নামে বিদ্যালয় পরিচালনা করত। কোনো কোনো নাইট স্কুল আবার সরকারের অর্থ সাহায্যও পেত। যেমন, ১৯২১ সালে কলকাতায় অনুশীলন সমিতির সভায় ভারত সেবক সঙ্ঘ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পুলিন দাস ছিলেন এই সংস্থার প্রধান। ভারত সেবক সঙ্ঘ প্রকাশ্যে গঠনমূলক কাজ করত। উদ্দেশ্য ছিল গোপনে অনুশীলন সমিতির সংগঠন বিস্তার।

ঢাকায় ভারত সেবক সঙ্ঘের পরোক্ষে পরিচালিত নাইট স্কুলে সরকারি অর্থ সাহায্যও এসেছিল। ব্রিটিশদের ধারণা হয়েছিল, বিপ্লবীরা হিংসার পথ ত্যাগ করেছেন। অথচ, গোপনে এইসব উদ্যোগের পথেই সংগঠন বিস্তৃত হয়েছিল। ১৯২১ সালে আসাম-বেঙ্গল রেলপথ ধর্মঘটে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন সমিতির বিপ্লবীরা। তার পরের বছর বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জী কুমিল্লায় সমবায় ভিত্তিতে একটি কারখানা গড়েন। সেখানে বিপ্লবীরাই ছিলেন মালিক তথা শ্রমিক। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা এই কাজ করেছিলেন। বিপ্লবী ভগৎ সিং উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জাতীয় বিদ্যালয়ে কিছুদিন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। গান্ধীজির গ্রাম স্বরাজ ভাবনা নিয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু, সেটাও ছিল বিকল্প পথের অনুসন্ধান।

দেশভাগের পর বাংলায় উদ্বাস্তু আন্দোলন বামেদের জমি শক্ত করেছিল। উদ্বাস্তু আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল বিদ্যালয় স্থাপন। পাড়ায় পাড়ায় মনীষীদের স্মরণে নানা অনুষ্ঠান করা। সেদিন সমাজের বিশিষ্টজনেরা বামপন্থী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নানা গঠনমূলক কাজে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা এভাবেই বাংলায় প্রবহমান ছিল। ড. মেঘনাদ সাহার মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানীও উদ্বাস্তু আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তরুণদের জন্য গড়ে তুলেছিলেন তরুণতীর্থ নামে প্রতিষ্ঠান। বামেদের এই কর্মকাণ্ডে শত প্ররোচনা সত্ত্বেও হিন্দুত্ববাদীরা বিশেষ সুবিধে করতে পারে নি।

আর এস এস সহ বিভিন্ন সংগঠন তাদের কর্মসূচি ও মতাদর্শ চর্চায় আজও অবিচল। নানা নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের ভিত গড়তে জন্মলগ্ন থেকে আজও সক্রিয়। বামেদের বড় অংশ কিন্তু তাদের সেই পথ ভুলে গেছে। তৃণমূলের মদতে আজ তাই বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠনের সক্রিয়তা বহুগুণ বেড়েছে।

অতীতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বামেদের সেই পথে ফিরতে হবে। ভোটে জেতা, হারার ওপর কর্মসূচি নির্ভর করে না। এটা এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। বিকল্পের চর্চা। তা হাতে নাতে রূপায়িত করা। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক-সামাজিক কর্মসূচি নেওয়া। সামবায়িক আদর্শে সীমিত পরিসরে আর্থিক কার্যকলাপ করা। যার মূল লক্ষ্য হবে যূথবদ্ধতা। বিজ্ঞানমনস্ক, পরিবেশ বান্ধব এক বিকল্প উন্নয়নের দিশা। সেই বিকল্প অনুশীলন বন্ধ হয়েছে বলে তার শূন্যস্থান দখল করছে নানা অসরকারি সংস্থা। বি-রাজনীতির রাজনীতি স্থিতাবস্থার সহায়ক হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকহিত প্রবন্ধে বলেছিলেন, '... ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপজ্জনক হইয়া ওঠে তখন বিপদটাকে কোনোমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়'। ঠেকো দিয়ে ঠেকানোর কাজটাই এন জি ও'র মাধ্যমে করানো হচ্ছে। আর তার পাশাপাশি জাল বিস্তৃত করছে আর এস এস সহ নানা ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন। বিকল্প নির্মাণ ও পুঁজিবাদী কাঠামোয় তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে হাতে কলমে অনুশীলনই পারে এই মানবসভ্যতা বিরোধী আক্রমণ প্রতিহত করতে।

মে দিবস কিছু কথা

শেষাদ্রি ভূষণ সাহা

পূর্ব সংখ্যার পরবর্তী শেষ অংশ—

যুগে যুগে বহু মনীষী দার্শনিকরা মানব মুক্তি, বিশ্ব মানবতা পৃথিবীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা ব্যর্থ হয়েছে বার বার, তৈরি করেছেন অনেক স্বপ্নের জাল, আসলে 'পৃথিবীকে বদলানো' এটাই আসল কাজ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান না হলে মানব সমাজের যে মুক্তি নেই, নেই বিশ্বে মানবতার স্থান, মার্কস বুঝতে পেরেছিলেন অন্তর দিয়ে। বিশ্বের অগণিত শোষিত খেটে খাওয়া মানুষেরাই পারে বিশ্বমানবের জন্ম দিতে। মার্কস বুঝতে পেরেছিলেন দেশ, ভাষা, জাতি, ধর্ম এই বেড়াজাল থেকে শ্রমিককে মুক্ত করা দরকার তবেই আসবে কাঙ্ক্ষিত ঐক্য। সে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ১৮৬৪ সালে নির্মিত 'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি সমিতি' প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠনের যার মধ্য দিয়ে মার্কস বিশ্বের অগণিত অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত করার এই কঠিন কাজে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আগামীদিনে মানব সমাজে এক ভয়াবহ সমস্যা ডেকে আনছে। 'গণবার্তা' পত্রিকাতে তুষার চক্রবর্তী দেখিয়েছেন কিভাবে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুঁজি নিজেকে সচল রেখেছে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে পুঁজির ভৌগোলিক স্থানান্তরণ, যা এখন এশিয়ায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। একুশ শতকে পুঁজিবাদ ঊনবিংশ, বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে কিভাবে বিভিন্ন সংকটের মধ্য দিয়ে উচ্চ প্রযুক্তির উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, প্রযুক্তির মেধাসত্ত্ব ব্যবহার করে, মুনাফা অর্জন করছে। তিনি আরও বলেন যে, এই সব প্রযুক্তি শুধু পুঁজিবাদী সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নয় এমনকি বিরোধী শক্তি এবং সংকট দমনের কাজে ফ্যাসিবাদী শক্তির রূপ নিচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কালেই যাকে সামাজিক এবং সামরিক কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই) বাণিজ্যের আড়ালে সার্বিক নজরদারি ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অসীম ক্ষমতা, এর বিস্তৃত ব্যবহার নাগরিকদের ডিজিটাল গোপনীয়তা ধ্বংস করেছে। চীনের সামাজিক ক্রেডিট সিস্টেম এর নামে নাগরিকদের আচরণ এবং বিশ্বস্ততার বিচার করে এবং তাদের জনসংখ্যার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখে। কোভিড-১৯ পাসপোর্টের আবির্ভাবের সাথে সাথে অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে পশ্চিম বিশ্বজুড়ে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ চালু করার দিকে হয়ত এটি প্রথম ধাপ। আগামীর আধুনিক পুঁজিবাদী যুদ্ধের আধিপত্য নির্ধারিত হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে।

এর ফলে লক্ষ লক্ষ নিম্ন-দক্ষতা থেকে মাঝারি-দক্ষতার চাকরি চলে যাবে। মধ্যম মানের দক্ষতা এবং উচ্চ-দক্ষতার শ্রমের মধ্যে আয়ের ব্যবধান বিশাল হবে। ভবিষ্যতে কম্পিউটার সুপারইন্টিলিজেন্স আমাদের অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলতে পারে। শ্রেণি বৈষম্য বাড়িয়ে তা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা স্থাপন করবে। পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষ চাকরি হারাবে। মার্কস তথ্য বিশ্লেষণে দেখিয়েছিলেন বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বিশ্বকে মুক্ত করতে। ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ইস্তেহার এ ছিল সেই অমোঘ ডাক ''দুনিয়ার মজদুর এক হও''। তিনি মন করেছিলেন জার্মানি, ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদ পরাজিত হলে গোটা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ তার থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার পথে এগিয়ে যাবেন।

এ বিষয়ে মার্কস-এর শিক্ষা-পুঁজি ও সামাজিক উৎপাদন একটি স্তরে না পৌঁছালে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার সুফল প্রসব করতে পারবে না। তিনি কখনই বলেননি যে, 'পুঁজিবাদের বিকাশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অত্যাবশ্যক প্রাক শর্ত'। নিজেদের কমিউনিস্ট বলে অনেকে প্রচার করে বলেন—সমাজতন্ত্রে পৌঁছাতে গেলে ইউরোপীয় কায়দায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই যেতে হবে। আসলে এ ধরনের চিন্তা ভাবনা যে এক ধরনের ভ্রম এবং যান্ত্রিক তা বারে বারে প্রমাণিত।

সম্প্রতি এ দেশে মোদি সরকার ভারতে ৪৪টি শ্রম কোড যথাক্রমে দ্য কোড অন ওয়েজেস, দ্য ইন্ডাস্ট্রিইয়াল রিলেশন কোড, দ্য অকুপেনশনাল সেফটি হেলথ এ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড, দ্য সোশ্যাল সিকিউরিটি কোড-এর মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়েছে দেশি-বিদেশি বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আগ্রাসনের নীল নকশার ঢালাও ব্যবস্থা। এই প্রথম ৮ ঘণ্টা কাজের পৃথিবীব্যাপী শ্রমিকদের অর্জিত অধিকারকে খর্ব করা হল ভারতবর্ষে। এই শ্রম কোড এর অধীন সংস্কারগুলি ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমশক্তিকে আরও প্রসারিত করবে, যার ফলে অনেকে আনুষ্ঠানিক চুক্তি এবং বেতন সহ ছুটি এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো সুবিধা এবং সুরক্ষা যা জুতা তৈরি থেকে আই টি শিল্প সহ সব জায়গায় শ্রমিকেরা তা থেকে বঞ্চিত হবে। ছাঁটাই, লকডাউন যথেচ্ছ হারে বাড়বে। শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার হারাবেন। শ্রমিকের ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে এই আইনে। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে দুর্বল করা হবে। শ্রমিক তার যৌথ প্রয়াস ভুলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হবে ফলে সেই সুযোগে শ্রমিকের শ্রম লুঠের অবাধ ব্যবস্থা আছে নতুন এই আইনে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর উন্নততম ২০টি দেশের মধ্যে অন্যতম একটি দেশ হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রায়ই নিজের ঢাক পেটান। অন্যান্য দেশ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা বিধির যে সব লক্ষ্যের কথা বলেন, ভারতবর্ষের নতুন সামাজিক সুরক্ষা কোডে-এর কোনো উল্লেখই নেই। এই শ্রমিক বিরোধী ৪টি নতুন শ্রম কোডে শ্রমিকের মজুরি বাড়বে না, বরং কমবে। মোদি সরকারের শ্রম সংক্রান্ত নতুন আইনগুলি আদানি-আম্বানি সহ দেশি বিদেশি বৃহৎ একচেটিয়া কারবারীদের অবাধ লুঠের ব্যবস্থাকেই শক্ত করবে। লগ্নীপুঁজির মুনাফা বাড়ানো একই সাথে শ্রমিকের মজুরি কমানো এই শ্রম আইন সংশোধনের মোদি সরকারের মূল উদ্দেশ্য একথা হলফ করে বলা যায়। কোভিড পরিস্থিতিতে জনগণকে মূল সমস্যার দাবি থেকে চোখ সরিয়ে রেখে, ধর্ম, জাতপাত হিংসার রাজনীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রেখে সংসদে বিনা বাধায় এই বিল পাশ করান মোদি সরকার। লক্ষ্য একটাই, একচেটিয়া পুঁজিকে আকৃষ্ট করা । ফলত পরিবেশ বিনাশী উন্নয়নের নকশায় লাফিয়ে বাড়বে বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ দূষণ, প্রকৃতি হারাবে তার ভারসাম্য।

সম্প্রতি হিন্ডেনবার্গ এর তথ্য সমৃদ্ধ রিপোর্ট সামনে এসেছে। সেই রিপোর্টে আদানির গোষ্ঠীর মতো বৃহৎ শিল্পপতি জনগণের সাথে কি বিপুল প্রতারণা করেছেন তার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১৭.৪ ট্রিলিয়ন। যার ফলে দেশের জনগণের কাছে মোদির আসল চেহারা বেআব্রু হয়েছে। দেশের জনগণ চিনতে পেরেছে এক গভীর দুর্নীতিবাজ এবং ধাপ্পাবাজ এক রাজনীতিককে। পুঁজিপতি শ্রেণির পি এম কেয়ার্স-এর নামে অথবা ইলেকশন বন্ডে রাশি রাশি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমা করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরও অসহনীয় দুর্বিষহ করে লুঠ চক্রের বিপুল দুর্নীতির মিলিঝুলি ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দিয়েছে মোদি সরকার। ফলে বিজেপি'র নির্বাচনী ফান্ডেই জমা পড়েছে লক্ষ্য কোটি টাকা, বিজেপি'র পরেই আছে তৃণমূল কংগ্রেস-এর স্থান। ফলে পুঁজিবাদীরা শ্রেণি স্বার্থ রক্ষা করতে দুজনেই একসাথে মিলেমিশে কাজ করে চলেছেন। এ কথা স্পষ্ট আজকের এ অবস্থা-১৯৯১ সালের নরসিমহা রাও গর্ভমেন্টের নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যার অশুভ সূচনা রচিত হয়েছিল।

আজ মে দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং আগামীদিনে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হে মার্কেটের মৃত্যুঞ্জয়ীদের সৃজনীতে জ্বলে উঠুক তার উত্তরাধিকার। সর্বহারা জনগণ কর্তৃক সামাজিক পরিবর্তন নয়, সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণি বৈষম্যকে বিলুপ্তির পথে মে দিবস ছিল এক উচ্চতর রাজনৈতিক পর্যায়। বিভিন্ন দলের সংস্কারবাদী নেতারা মে দিবসকে সংগ্রামের দিনের পরিবর্তে বিনোদনের দিনে পরিণত করে বিপথগামী করার চেষ্টা করেছিলেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য শ্রমজীবী মানুষদের লড়াই করার ইচ্ছা ছিল মে দিবস আন্দোলনের প্রকৃত শ্রেণি চরিত্র। পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে, সারা বিশ্বের অগণিত অসংগঠিত শ্রমিককে সংগঠিত করার আহ্বান ছিল মে দিবস, তাই মে দিবসের আওজ আন্তর্জাতিক। শ্রমিকের দাবি দাওয়ার আন্দোলনকে রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ দিয়েছিল মে দিবস। রোজা লুক্সেমবার্গের ভাষায়—যতদিন সকল দাবি পূরণ হবে না, বুর্জোয়া ও শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে, ততদিন মে দিবস এই দাবিগুলোর বার্ষিক অভিব্যক্তি হয়ে থাকবে। আরও ভাল দিল যখন আসবে, যখন বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণি তার মুক্তি অর্জন করবে, তখন মানবতা সম্ভবত অতীতের তিক্ত সংগ্রাম এবং অনেক কষ্টের সম্মানে মে দিবস উদযাপন করবে।

তথ্য সূত্র :—

১) ''ক্যাপিটাল'' প্রথম খণ্ড, অধ্যায় ১০।
২) ''হিস্টোরি অফ মে ডে'' বাই আলেকজান্ডার ট্রাকেনবার্গ।
৩) 'গণবার্তা' মুখপত্র আর এস পি।

অমর্ত্য সেন রচিত হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড প্রসঙ্গে

প্রসঙ্গ :

বিশ্বভারতী কোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। নিজের সর্বস্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন শান্তিনিকেতন, ডেকে এনেছিলেন দেশের নানা প্রান্ত থেকে শিক্ষাবিদ গুণীজনদের। পরে তাঁর পুত্র বিশ্বভারতীর জমিতে বসত করিয়েছিলেন নানা মানুষকে, তাঁদের দীর্ঘমেয়াদী 'লিজ' দিয়ে।

সে সময় কবি ও তাঁর উত্তরাধিকারীর ধনসম্পদ বলতে ছিল উপযুক্ত শান্তিনিকেতনের পরিবেশ। নির্জন, নিভৃত সৌন্দর্যের ভিতর বসে জ্ঞান ও শিল্পচর্চার অবকাশ। সেইটুকু তাঁরা দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের আসা শিক্ষক ও গুণীজনদের।

১৯৪৩ সালে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বিশ্বভারতীর সম্পাদক, তখন অমর্ত্য সেনের পিতা আশুতোষ সেন এবং রথীন্দ্রনাথের মধ্যে ১৯৪৩ সালে লিজ-এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, যার রেজিস্ট্রেশন হয় ১৯৪৩-এর নভেম্বর মাসে। অমর্ত্য সেন তখন বালকমাত্র।

১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বভারতী অধিগ্রহণ করে। ১৯৫৫-৫৬ সালে রাজ্যের ভূমি দপ্তর 'লেসি'দের নিজ নিজ দখল অনুযায়ী জমি রেকর্ড করে দেয়।

১৯৯৮ সালে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর একজন বি বি সি রিপোর্টার অমর্ত্য সেনকে প্রশ্ন করেন, কোথায় থাকাটাকে আপনার 'বাড়ি' (Home) বলে মনে করেন। সেই মুহূর্তে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ব্রিটেনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিনিটি কলেজে পুনরায় যোগ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন অমর্ত্য সেন। নির্দ্বিধায় অমর্ত্য সেন জানিয়ে দিলেন, এই মুহূর্তে আমি এখানেই বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছি। কেম্ব্রিজ, হার্ভার্ড স্কোয়ারে, ভারতে এমনকি শান্তিনিকেতনের আটচালায় আমি একই 'গৃহসূখ' পেয়েছি।

গৃহসুখ (Home) বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে অমর্ত্য সেন শৈশবে একটা ধারণা পেয়েছিলেন। বাবা আশুতোষ সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রি পড়াতেন, মা অনিতা সামাজিক কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকে নাচতেন, দাদু ক্ষিতিমোহন সেন অসাধারণ পণ্ডিত। এই বোধ সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকা (যৌথ), আম-কাঁঠালের বাগান, চাঁপা ফুলের সুগন্ধ গোটা বাড়িকে মাতিয়ে রেখেছে—১৯৪৭ দেশ ভাগের আগে বাড়ির নাম ছিল জগৎকুটীর।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত সাত বৎসর বয়সে অমর্ত্যের পাঠ শুরু, সবে মিলে যে আনন্দমেলা তাইতো বাড়ি (গৃহসুখ)। এটাই হচ্ছে 'Concept of Home'।

শৈশবের সাথী ভাবীকালের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ই এম ফস্টার (E M Forster), গ্রীসের ভাবী প্রধানমন্ত্রী এ্যানড্রিস পঁপেদু, ক্যানসার গবেষক শ্যামালা গোপালান, তাঁর স্বামী অর্থনীতিবিদ ডোলাল্ড হ্যারিস। সবে মিলে যে অসাধারণ চেনা পরিবেশ তাঁকে স্বীকৃতি, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা দিয়েছে তাই মিলে মিশে তাঁর বাড়ি (Home) তৈরি হয়েছে।

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর অমর্ত্য সেনকে নোবেল ফাউন্ডেশনের পক্ষে জিজ্ঞাসা করা হয়, স্টকহোমে নোবেল মিউজিয়ামে কোন্ দুটি বস্তুকে রাখা যায়।

অমর্ত্য সেন জবাব দেন :

১. আর্যভট্ট : গণিত শাস্ত্রের ওপর ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টিশীল কাজ।

২. তাঁর ব্যবহারের প্রথম বাই-সাইকেল (ATLAS), ১৯৪৫-১৯৯৮ যেটি তিনি ব্যবহার করতেন।

অমর্ত্য সেন হচ্ছেন যথার্থ 'Cosmopolitan'। তাঁর এই সার্বভৌম জীবনাদর্শ বা বিশ্বজনীন বোধ এসেছে 'Cosmos of his Family life' থেকে। এই 'Family life' একটি চেতনা যার সাথে মিল আছে রবীন্দ্রনাথের, বিরোধ আছে হেগড়ে — গোলওয়ালকারের সাথে। সেই বিরোধ আজ চলে আসছে শান্তিনিকেতনে, যার ছবি ফুটে উঠছে রাজনীতিতে, বৃহত্তর সমাজে।

— প্রমথেশ মুখার্জী

পি এস ইউ সংবাদ

মুর্শিদাবাদে পি এস ইউ-এর কর্মশালা

প্রোগ্রেসিভ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (PSU) মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে নির্দিষ্ট ভাবে বাছাই ৩২ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে গত ৬-৭ মে দুদিনের রাজনৈতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ৬-৭ মে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক কর্মশালা শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নওফেল মহাঃ সফিউল্লা। এই কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি জিয়াউল হক। কর্মশালার উদ্বোধন করেন সংগঠনের প্রাক্তন নেতৃত্ব তথা বর্তমান আর এস পি'র মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কম. অঞ্জনাভ দত্ত। তিনি এই সময়ে সংগঠন গড়ে তোলার বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেন। সেই সাথে পি এস ইউ-এর সংগঠনের কর্মীদের আচরণ কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালায় সংগঠনের জেলা সম্পাদক কম. হাবিবুর রহমান সোহেল নয়া জাতীয় শিক্ষা নীতি কি এবং কেন এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সে বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক কম. দেবজ্যোতি দাস সংগঠনের সদস্যপত্র কিভাবে সংগ্রহ করতে হয় এবং কেন ছাত্র ছাত্রীরা পি এস ইউ এর সদস্য হবে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পি এস ইউ-এর দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস ও বর্তমান সময়ের ছাত্র আন্দোলনের বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই দুদিনের কর্মশালাতে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা পোস্টার লেখা, স্লোগান দেওয়া, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও অর্থ সংগ্রহের কর্মসূচিতে সামিল হয়। এছাড়াও কর্মশালার সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন আর ওয়াই এফের জেলা সম্পাদক কম. একে এম হাসানুজ্জামান।

এই বিশেষ কর্মশালার আয়োজন বিশেষ শৃংখলা ও নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। আগামীদিনে এ ধরনের কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মত প্রকাশ করে। সকলেই একমত যে, বর্তমান সময়ে জঙ্গি ছাত্র আন্দোলনের পথে চলতে না পারলে রাজ্যের ও দেশের ছাত্রসমাজ গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

আলিপুরদুয়ারে পি এস ইউ-এর কর্মশালা

গত ৮-৯ মে আলিপুরদুয়ার জেলায় নির্দিষ্ট ভাবে বাছাই করা ২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে পি এস ইউ-এর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় আলিপুরদুয়ার শহরে। এই কর্মশালা সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সাধারণ সম্পাদক নওফেল মোহাঃ সফিউল্লা। দুদিনের কর্মশালারা উদ্বোধন করেন আর এস পি আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সম্পাদক কম. সুব্রত রায় ও কর্মশালাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক আন্দোলনের নেতা তথা প্রাক্তন শিক্ষক কম. নির্মল দাস। এদিনের কর্মশালাতে সংগঠনের জেলা সম্পাদক কম. রাজীব হুসেন সংগঠনের সদস্যপত্র কিভাবে সংগ্রহ করতে হয় এবং এই সময়ে কেন ছাত্র ছাত্রীরা পি এস ইউ-এর সদস্য হবে তার ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখে।

দুদিনের এই কর্মশালা সঞ্চালনা করেন পি এস ইউ'র প্রাক্তন জেলা সম্পাদক কম. সঞ্জীব বক্সি। এই কর্মশালার শুরুর প্রথম দিন সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে একটি পথসভা সংগঠিত করে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি ও রাজ্যে ৮০০০ এর বেশি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখে সংগঠনের জেলা সম্পাদক কম. রাজীব হুসেন, রাজ্য সভাপতি কম. হাবিবুর রহমান সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সফিউল্লা। কর্মশালার মাঝে ৯ই মে পি এস ইউ ও ক্রান্তি শিল্পী সংঘের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন আজও প্রাসঙ্গিক সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন পি এস ইউ-এর সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা। এই কর্মশালাতে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা দুদিন ধরে পোস্টার লেখা, স্লোগান দেওয়া ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দেবার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। এবং সংগঠনের রাজ্য সভাপতি নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি কি এবং কেন এর বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সে বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেন। কর্মশালার শেষে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সফিউল্লা সংগঠনের দীর্ঘ ইতিহাস ও আজকের দিনে ছাত্র আন্দোলনের বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন।

পি এস ইউ'র বাঁকুড়া জেলা কনভেনশন

গত ১৪ মে পি এস ইউ বাঁকুড়া জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় বাঁকুড়া শহরে। দীর্ঘদিন পরে বাঁকুড়া জেলায় পি এস ইউ'র এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সংগটনের রাজ্য সম্পাদক কম. কৌশিক ভৌমিক। তিনি এই কনভেনশনে উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি কি এবং কেন এর বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন। এদিনের কনভেনশনে আর এস পি বাঁকুড়া জেলা কমিটির সম্পাদক কম. সুনীল পাত্র কনভেনশনে আলোচনা করেন। কম. পাত্র বলেন কিভাবে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে এবং ছাত্রদের সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন। ছাত্রছাত্রীদের সহ অন্যান্য পার্টি নেতৃত্ব। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে কম. দিপালী মাল, জয়ন্ত মাহাতো ও রাজেন্দ্রনাথ হাঁসদাকে জয়েন্ট কনভেনর নির্বাচিত করে আগামী ৪ জুন সংগঠনের একটি রাজনৈতিক কর্মশালার আয়োজন করা হবে বলে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পি এস ইউ'র ময়নাগুড়ি সম্মেলন

গত ১০ মে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে কমরেড গোবিন্দ দে ভবনে পি এস ইউ'র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই সম্মেলন উদ্বোধন করে আর এস পি জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কম. সন্তোষ সরকার। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কম. হাবিবুর রহমান সোহেল এবং সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সফিউল্লা। কম. সফিউল্লা এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি কি এবং কেন এর বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সে বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। সম্মেলন শেষে ১৪ জনের একটি কমিটি নির্বাচিত করা হয় যার সম্পাদক নির্বাচিত হন কম. মুর্শিদ আলম এবং সভাপতি নির্বাচিত হন কম. জয়ন্ত রায়। আশা করা যায় যে, আগামী দিনে জলপাইগুড়ি জেলায় শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্রদের সভা

গত ১২ মে দিল্লীতে কম. হরকিষেণ সিং সুরজিৎ ভবনে পি এস ইউ সহ দেশের ১৪টি ছাত্র সংগঠনের একটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পি এস ইউ এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা। তিনি যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠনের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এস এফ আই, এ আই এস এফ, এ আই এস বি, আয়ইসা সহ কংগ্রেস, আর জে ডি, ডি এম কে, সমাজবাদী পার্টি ও আম আদমি পার্টির ছাত্র সংগঠন। এই সভা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি সহ দেশজুড়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সমস্ত ছাত্র ছাত্রী স্বার্থ বিরোধী কমসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রের আর এস এস পরিচালিত বিজেপি সরকারের শাসনে সাধারণ বা স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার ছিনিয়ে নেবার ষড়যন্ত্র চলছে।

এ ধরনের অপকৌশলের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে সমস্ত আর এস এস ও বিজেপির বিচারধারা বিরোধী সমস্তছাত্র সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করা হবে একটি মঞ্চে সামিল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এমন মঞ্চের মাধ্যমে দেশের সরকারকে একটি বিকল্প শিক্ষানীতির প্রস্তাব দেওয়া হবে। বিভিন্ন রাজ্যে এই মঞ্চের উদ্যোগে সম্মিলিত ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং এ বছর পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের সময় দেশের সমস্ত প্রগতিশীল ছাত্রছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ করে বৃহৎ আকারে পার্লামেন্ট ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সেই লক্ষ্যে আগামী ১৪ জুন দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের যৌথ আন্দোলনের মঞ্চের নাম ঘোষণা করা হবে। প্রাথমিক ভাবে এই সংগঠনগুলির পক্ষে গত ১৩ মে দিল্লীর যন্তরমন্তরে ধর্না অবস্থানরত জাতীয় স্তরের কুস্তিগীরদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে ধর্নায় সামিল হয়। এই ধর্না মঞ্চে পি এস ইউ-এর সাধারণ সম্পাদক জাতীয় কুস্তিগীর আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে বলেন অবিলম্বে বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ, শরণ সিংকে গ্রেফতার করতে হবে এবং যে সরকার 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' স্লোগান দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে, তারা দেশের সম্মান যাঁরা বাড়িয়েছেন সেই বেটিদের সম্মান রক্ষা করার পরিবর্তে ভক্ষকের কাজ করে, সেই সরকার কখনও দেশের সম্মান রক্ষা করতে পারবে না। এই ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরও বলেন যে মোদি সরকার এক নিম্নশ্রেণির গুন্ডাকে ভয় করছে। নাবালিকাদের ওপর যৌন শোষণের গর্হিত অপরাধকেও মেনে নিচ্ছে।

পাঞ্জাবে পি এস ইউ'র সভা

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে দেশ জুড়ে শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ১৪ মে পাঞ্জাবের খান্নাতে পি এস ইউ'র সভা অনুষ্ঠিত হল। এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন পি এস ইউ'র সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সফিউল্লা। কম. সফিউল্লা এদিনের সভায় উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের বলেন কেন্দ্রের আর এস এস পরিচালিত বিজেপি সরকার ছাত্র স্বার্থ বিরোধী নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে এসেছে। কেন তার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে তার ব্যাখ্যা করেন এবং এই সময় এন সি আর টি যেভাবে যেভাবে সিলেবাস বদল করছে তার বিরুদ্ধেও ছাত্রদের সংগঠিত হয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সেই সাথে তিনি বলেন পাঞ্জাবের মাটিতে জন্ম হয়েছিল বিপ্লবী ভগৎ সিং, যার আদর্শ পি এস ইউ বহন করে, সেই আদর্শের পথে আগামী দিনে, পাঞ্জাবে ভগৎ সিং-এর উত্তরসূরীদের সংগঠন পি এস ইউ গড়ে তোলার কাজে সকলকে নিয়োজিত হতে হবে। এই সভা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ এবং গেরুয়াকরণের বিরুদ্ধে আগামী দিনে পি এস ইউ'র উদ্যোগে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এদিনের সভায় সংযুক্ত কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদক কম. কর্নেল সিং উপস্থিত ছিলেন এবং ছাত্রদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

সংঘ পরিবার বিষাক্ত প্রচারে দেশের সর্বনাশ করে চলেছে।

১-এর পাতার পর—

প্রজাবাৎসল্যের অনন্য করুণায়। শাসক দলের প্রচার এমনটাই। গণতন্ত্র নিয়ে মাথাব্যথা অযথা যেন প্রজাদের পীড়িত না করে। নরেন্দ্র মোদি সাধারণ চা বিক্রেতা থেকে দেশের সর্বশক্তিমান প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সেখান থেকে তিনি রাজা বা সম্রাটে উত্তীর্ণ হয়ে এখন ঈশ্বর হবার দাবিদার। এসব কিছুই বিশ্বাস করতে হবে। প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রকাশ ভাল প্রজাদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। রাজানুগ্রহ লাভে সমস্ত দেশবাসীকে একই দিকে ধাবিত হতে হবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য অশ্রুমোচন বিজয়ীদের শোভা পায় না।

একদা 'হিন্দু হৃদয় সম্রাট' এখন বিশ্বগুরুতে উত্তীর্ণ। তিনি এবং তাঁর অনুগত চ্যালা চামুন্ডারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে হয়তো বেঁচে থকার ন্যূনতম অধিকারটুকু দেবে। কিন্তু একটু ট্যা ফোঁ করলেই আখলাখ বা ইদ্রিশ পাশা অথবা আরও অনেক হতভাগ্য নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষদের যে পরিণতি হয়েছে তাই হবে এবং নির্বিচারেই হবে। মহামহিম রাষ্ট্রশক্তির ওপর প্রতিনিয়ত আস্থা স্থাপন করে চলাই বিধেয়। কোনও এদিক ওদিক হলেই নেমে আসবে মৃত্যুর ঘোর অন্ধকার।

চলমান সমাজ রাজনীতির যে সংস্কৃতি প্রায় দেশের সর্বত্র আগ্রাসী রূপে দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে ন্যায্যতা ও নৈতিকতা আদৌ নেই। নৈতিকতার প্রশ্ন তোলা অবশ্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃত অভিজ্ঞান। কিন্তু তা বর্তমান রাষ্ট্রশক্তির কাছে বিষম অপছন্দের। নীতি নৈতিকতা নিয়ে যে সিদ্ধান্ত মোদি নেবেন তা-ই একমাত্র বিবেচনার। অন্য কোনও মত কিংবা প্রশ্ন অবশ্যই দেশদ্রোহিতার দোষে দুষ্ট। দুষ্ট লোকের শাস্তি প্রাপ্য। সেই শাস্তি চরম হলেও তার বিরোধিতা করা বিধেয় নয়।

যুক্তিনিষ্ঠ মন মানসিকতার ধ্বংসস্তুপের ওপরেই উন্নত ভারত নির্মাণের স্বপ্নে মশগুল মোদি ও তার গেস্টাপো বা খুনে বাহিনী। মুসলমান, খ্রিস্টান এবং কমিউনিস্ট বা মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা বেঁচে থাকার অধিকার অবশেষে হারাবে! আজ না হোক, কাল তা-ই হবে। সুতরাং যুক্তিবাদীদের কর্তব্য ওই সব বদ অভ্যেস পরিত্যাগ করে রাম বা কেষ্টর বর্তমান অবতার নরেন্দ্র মোদির ভজনায় মেতে ওঠা। বিগত দুই শতাধিক বছর আগে ইয়োরোপ মহাদেশে যে আলোকায়নের সময়কাল প্রচলিত হয়েছিল তার অপশিক্ষা যেন ভুলে যান যুক্তিবাদীরা। তাতেই তাঁদের মঙ্গল। ভারতের ক্ষেত্রে অবশ্য যুক্তিবাদের চর্চা, প্রশ্ন করে সত্যসন্ধানের রীতি ইয়োরোপের অনেক শতাব্দ আগেই ছিল। ভারতবর্ষে চার্বাক দর্শন বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছিল। সেসবও ভুলে যেতে হবে। সমস্ত মিথ, মিথ্যা/কল্পকাহিনীকে সর্বাধুনিক বলে মেনে চলতে হবে, এমনই নিদান শাসকদলের। কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনেও একই ধর্মীয় মেরুকরণ এবং উগ্রহিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক বর্বরসুলভ প্রচারে মগ্ন শাসকদল। এ অবস্থা চলতে পারে না।

Vol. 70 Issue No. 30 শনিবার, ১৩ মে ২০২৩ আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

Postal Regd. No. SSRM/KOL.-RMS/W.B./R.N.P. 206/2007-09
Licenced to post without pre-payment/Licence No. MM & PO/
SSRM-KOL-RMS/R.N.P. 206/LPWP 042/2007-09

ভারতীয় শ্রমজীবী মানুষের ঝুঁকির জীবন

সুশোভন ধর ও হিতেশ পোদ্দার

অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং শিল্পে অগ্রগতির সাথে সাথে ভারতে পাল্লা দিয়ে আরও একটি বিষয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার এই ক্রমবর্ধমান উর্ধগতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অসংখ্য জীবন নিভে গেছে অথবা এমনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা অপূরণযোগ্য। এর একমাত্র কারণ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক নিরাপত্তা বন্দোবস্তের অভাব এবং ন্যূনতম নিরাপত্তাহীন কাজের পরিবেশ।

Directorate General Factory Advice Service And Labour Institute এর ২০২১-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী সর্বমোট ৩২, ৪১৩টি দুর্ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে, যার ফলশ্রুতি ১০৫০ জন শ্রমজীবীর মৃত্যু এবং ৩৮৮২ জনের শারীরিক আঘাত। (২০২০ সারণী-১)

মনে রাখতে হবে DGFASLI দেওয়া তথ্য অসম্পূর্ণ, সমস্ত দুর্ঘটনা, মৃত্যু বা আহত হবার ঘটনা এতে নথিবদ্ধ হয়নি। এর তিনটি কারণ আছে। প্রথমত DGFASLI -এর রাজ্যওয়ারি প্রধান পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় পরিদর্শকরা তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু সমস্যা হল প্রতি ৫০০ কারখানার জন্য একজন স্থানীয় পরিদর্শক বরাদ্দ, তথ্যের সঠিক নথিভুক্তিকরণের জন্য যা একেবারেই অপর্যাপ্ত।

দ্বিতীয়ত, DGFASLI -তে প্রায় ৫০ শতাংশ নিরাপত্তা পরিদর্শক, স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং রাসায়নিক দূষণ পরিদর্শক পদ শূন্য। উপযুক্ত কর্মীর অভাব শুধু তথ্য সংগ্রহকে অসুবিধাজনক করে তোলে তাই নয়, যথাযথ পরিদর্শন প্রক্রিয়াটিকে অসম্ভব করে তোলে। তৃতীয়ত, অর্থনীতির ক্রমাগত অসংগঠিতকরণ অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রকল্পকে (MSME) শিল্প প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র থেকে বিযুক্ত করেছে। MSME গুলি মোট জাতীয় উৎপাদনের ৯০ শতাংশ এবং কর্মসংস্থানের ৩৩ শতাংশ অবদান রাখে। ফলে নথিভুক্ত কারখানার মাত্র ২২ শতাংশ এবং ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার ৩৫ শতাংশ পরিদর্শন করা সম্ভব হয়। MSME গুলিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো বিধি বিধানের ব্যবস্থা নেই।

সারণী-১ যদিও আহতের সংখ্যায় ৭০ শতাংশ অবনমন দেখাচ্ছে ২০১৫-১৬তে, দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর ঘটনা গত দশ বছরে একই হার বজায় রেখেছে। আরো দেখা যাচ্ছে দুর্ঘটনা ও আহতের তুলনায় মৃত্যুর হার নাটকীয় ভাবে ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী-২তে দেখা যাচ্ছে অধিকতর শিল্পায়িত রাজ্যে (গুজরাত, মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ু) অধিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হার।

এতদসত্ত্বেও ফ্যাক্টরি আইন না মানার জন্য মাত্র ২৫৬৩ জনের সাজা হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ১০ জনের কারাবাস।

ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায় হয়েছে মাত্র ৩ কোটি টাকা। মালিক বা ঠিকাদার সর্বদাই দায়িত্ব এড়িয়ে যায় বা চেষ্টা করে।

প্রথমত তারা কোনো নিরাপত্তা পরিদর্শক বা সরকারি আধিকারিকের কাছে দুর্ঘটনা নথিবদ্ধ করে না আইনি পদক্ষেপের ভয়ে। তারা আহত শ্রমিককে সরকারি ক্ষেত্রের পরিবর্তে ন্যূনতম পরিকাঠামোহীন বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসার খরচ ও নামমাত্র বহন করে।

এমনিতেই ভারতে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কাঠামোগত ঘাটতি রয়েছে। যে কারণে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও শ্রমিকের স্বাস্থ্যহানির ঘটনা অত্যন্ত সুলভ। আইনি বিধি বিধান কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয় না। সমস্ত ধরনের শিল্পক্ষেত্র এবং পেশা এই আইনের আওতায়ও আসে না। তাই আইনের ফাঁকফোকর এবং তার প্রয়োগে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েই যায়। কয়েক ধরনের শিল্প এবং সমগ্র অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের শ্রমিকরা সুরক্ষা আইনের বাইরে থেকে যান এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিপজ্জনক কর্ম পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য হয়।

শ্রমজীবী শ্রেণির স্বাস্থ্যের বিষয়টি একেবারেই অবহেলিত। অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুযোগ বা স্বাস্থ্যবীমার সুরক্ষা পান না। অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জার বিষয় যে পয়সা বাঁচানোর জন্য সবচেয়ে আগে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাই যে শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রতি এই অবহেলা ভারতে সুস্থায়ী অর্থনীতি গড়ে ওঠার পথে প্রধান বাধা। বৈষম্যহীন সমাজ তো দূর শ্রমিকের স্বাস্থ্য, সুরক্ষাও সম্মানজনক পারিশ্রমিককে অগ্রাধিকার না দিয়ে কোনো শিল্প পরিকল্পনার সাফল্য আশা করা যায় না।

সারণী-১

বছর	দুর্ঘটনা	নিহত	আহত	মোট
২০১১	৬৪৯	১,৩৯৪	২৮,৮০৫	৩০,১৯৯
২০১২	১,৩১০	১,৩১৭	২৮,৭০০	৩০,০১৭
২০১৩	১,৩৪৩	১,৩১২	২৬,৮৫২	২৮,১৬৪
২০১৪	১,৫৩৪	১,২৬৬	২৫,৫০০	২৬,৭৬৬
২০১৫	১,০৯১	১,১০৭	২০,২৫৭	২১,৩৬৪
২০১৬	৭০০	১,১৮৯	৫,৩৮৭	৬,৫৫৬
২০১৭	১,৩৮২	১,০৮৪	৪,৮৬৬	৫,৯৫০
২০১৮	১,১২৪	১,১৫৪	৪,৫২৮	৫,৬৮২
২০১৯	১,৩৭১	১,১২৭	৩,৯২৭	৫,০৫৪
২০২০	৬৩৪	১,০৫০	২,৮৩২	৩,৮৮২

সারণী-২

রাজ্য	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬৮	৬৮	৬৮	৬১	৭২	৬৬
আসাম	৮	১২	১০	১২	৪	১০
বিহার	১০	১১	১৭	২১	৮	১২
ছত্তিসগড়	৭৪	৮১	৭২	৯১	৮৬	৮৪
দাদরা নগর	১২	১৫	১৬	২৫	৯	৫
হাভেলি দিল্লি	৬	১০	৩৭	৫	৬	৯
গোয়া	৮	৩	৫	৩	৩	৬
গুজরত	২০৬	১২৭	২২৯	২৬৩	২১৬	২১২
হরিয়ানা	৪১	৬৭	৪৯	৪৫	২৬	৩৫
হিমাচল প্রদেশ	৪	৯	১৪	৯	৯	৮
ঝাড়খণ্ড	২৯	২১	১৭	১৮	২১	১৬
কর্ণাটক	৭২	৫৪	৪৯	৮৫	৬৯	৪৫
কেরালা	২০	১৮	১৬	২২	২৯	১৪
মধ্যপ্রদেশ	৪৪	৩০	৩০	২২	৪৪	২৬
মহারাষ্ট্র	১৪৫	১৫০	১৩৭	১৪২	১৪৫	১৫৪
ওড়িশা	৫৫	৪৬	৫২	৪২	৩২	৪৭
পাঞ্জাব	২১	২৩	২০	১৬	৬৪	২৮
রাজস্থান	৩৩	১৫	৩১	৩২	৩২	২৩
তামিলনাড়ু	৮৭	১০৪	৭১	৮৪	১২২	১১৪
তেলেঙ্গানা	৫৭	৬৩	৭০	৪৩	৫৬	৫১
উত্তরপ্রদেশ	৩৯	৪৬	৫৮	৪৮	৪৬	৬৬
উত্তরাখণ্ড	২১	১০	৯	১৫	২০	১৫
পশ্চিমবঙ্গ	৩৮	৫৪	#	৩৯	#	#
মোট	১,১০৭	১,১৮৯	১,০৮৪	১,১৫৪	১,১২৭	১,০৫০

কমরেড অনন্তদেব মণ্ডল প্রয়াত

সারা ভারত সংযুক্ত কিষাণ সভার প্রাক্তন বীরভূম জেলা সম্পাদক তথা আর এস পি-র প্রাক্তন বীরভূম জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম নেতা কম. অনন্ত দেব মণ্ডল প্রয়াত হন ৭ মে রবিবার দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। কম. মন্ডলকে দলীয় রক্তপতাকা ও ফুলের মালা দিয়ে শেষ বিদায় জানান আর এস পি-র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. সুবীর হাজরা এবং জেলা কমিটির সদস্য কম. পারভেজ মনির (পলাশ)।

কম. অনন্ত দেব মন্ডল লাল সেলাম।

কম. অনন্ত দেব মণ্ডল অমর রহে॥

সুদানে সেনা এবং আর এস এফের সংঘর্ষে নাজেহাল নাগরিক সমাজ

এক সপ্তাহব্যাপী আলাপ আলোচনার পর সংঘর্ষ রত সেনা এবং আর এস এফ নেতৃত্ব দেশবাসীর মৃত্যু ও জীবনন্ত্রণা উপশমের জন্য কয়েকটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং দ্রুত রিলিফ বন্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদে নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়া রিলিফ কর্মীদের সর্বাত্মক নিরাপত্তা দেওয়া এবং নিরীহ সাধারণ মানুষদের ঢাল রূপে ব্যবহার করার হিংসাত্মক পথ পরিহার করার কথা মেনে নিয়েছে উভয় গোষ্ঠী। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উভয়পক্ষের পক্ষ থেকে সেরকম কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

এইসব তথাকথিত মানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সত্ত্বেও সংঘর্ষ বন্ধ করতে এই মুহূর্তে কোনো পক্ষই রাজী নয়। গত শুক্রবারও খার্তুমে বিমান হানা ও বোমাবর্ষণ চলেছে।

বেশ কয়েকবছর ধরেই সুদানের রাজধানী খার্তুম এবং দেশের অন্যত্র নিয়মিত সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ থেকে সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। দরিদ্রতম এই আফ্রিকার দেশটিতে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের বার্ষিক গড় আয় মাত্র ৭৫০ ডলার। অধিকাংশ সুদানবাসী মুসলিম ধর্মাবলম্বী এবং ইংরাজী ও আরবি ভাষায় অভ্যস্ত। এখানে সামরিক ক্ষমতার দুটি শিবির। একটির জেলাশাসক মেনেরাল আবদেল ফাতাহ আল-বারহান। ইনিই কার্যত দেশের রাষ্ট্রপতি।

অপরজন উপ-সেনানায়ক আর এস এস এফের প্রধান মহম্মদ হামদাত ভাগালো।

দুজনের মধ্যে একটি বিষয়েই মিল। কেউই সাধারণ নাগরিকদের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক শাসন চান না। আর এস এফে বহু আধাসামরিক সেনা নিয়োগ নিয়েই উভয়পক্ষে শক্তির পরীক্ষা চলতে থাকে। কার্যত যুদ্ধ শুরু হয়। আর এই গৃহযুদ্ধের ফলে প্রাণ হারাচ্ছেন গৃহহীন বহু সাধারণ মানুষ।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-